নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

BANSDOC Library Dhaka

- আহামরি ডি,এন,এ
- পানি সম্পদ
- সবচেয়ে কাছের বন্ধু উদ্ভিদের ভেষজ গুণ
- জগদীশ চন্দ্র বসু : রেডিও বিজ্ঞানের জনক

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী :
জনাব সুকল্যাণ বাছাড়
কিউরেটর (একাডেমিক)
জনাব মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব মুমিনুর রশিদ
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা ও মুদ্রণে :
অনুপম প্রিন্টার্স

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রকাশকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমন্ডলী :
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর
জনাব সৈকত সরকার
উপ-প্রধান ডিসপ্লে কর্মকর্তা

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
আর্টিস্ট

অঙ্গসজ্জা / মুদ্রণালয় :
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭। ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infonmst@gmail.com

সূচিপত্র

- আহামরি ডিএনএ — ১
  — সৌমেন সাহা
- মৌমাছি পালন ঃ অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত — ১৩
  — মোঃ নজরুল ইসলাম
- দূর ও নিকট বন্ধু লেজার — ১৯
  — সুব্রত কুমার সাহা
- পানি সম্পদ — ২৭
  — কাজী রিচি ইসলাম
- সবচেয়ে কাছের বন্ধু উদ্ভিদের ভেষজ গুণ — ৩০
  — হোসনে আরা পারভীন
- ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষি — ৩৫
  — তাছলিমা আক্তার
- পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা
  পৃথিবীর পরিবেশ করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে — ৩৮
  — কৃষিবিদ আলী আকবর
- জগদীশ চন্দ্র বসু : রেডিও বিজ্ঞানের জনক — ৪৪
  — নুরুন নাহার কবিতা

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন

মুখবন্ধ

বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু-কিশোর ও তরুণদের বিজ্ঞান মনস্কতা জাগিয়ে তোলা, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চিন্তার পরিধিকে বাড়িয়ে দেয়ার জন্য আমাদের এ ত্রৈমাসিক প্রকাশনা। বিজ্ঞান ভিত্তিক রচনার পাঠক ও লেখক তৈরি, তরুণ লেখকদের বিজ্ঞান ভাবনাকে সকল উৎসাহী পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এ প্রকাশনা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় আমাদের এই প্রকাশনা একটি অবয়ব পেয়েছে তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রকাশনাটি একটি মানোন্নীত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ প্রত্যাশা করি।

স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

আহামরি ডিএনএ

সৌমেন সাহা

মানুষ সমাজে থাকে। একসময় সমাজে থাকত না। একা একা বাঁচত। বিপদ বেশি বুঝতে পেরে দল বেঁধেছে। পশু শিকার আর ফলমূল আহরণ করে বেঁচেছে মানুষ। খাবার জোগাড় করতে তাকে রোজ বনজঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হত। মানুষের বিশ লক্ষ বছরের ইতিহাস জীবনে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে চাষবাস এল। এই চাষবাস জীবনের খোল পাল্টে দিল। অবসর খুঁজে পেল মানুষ। পাথরে পাহাড়ি নানা রঙের মাটি দিয়ে ছবি আঁকতে থাকল। পাথর ভেঙ্গে তৈরি করতে চাইল ভাস্কর্য। তাঁত বুনে কিছু শরীরের আবরণ তৈরি করতে চাইল। জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য আনতে উপকরণ বাড়তে থাকল একের পর এক। জীবন ভাবনায় 'জিজ্ঞাসা' এল। নানারকমের জিজ্ঞাসা। শুধু খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকা মানুষের ধর্ম রইল না আর। ঘরের দাওয়ার বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা যেমন, ঘর ছাড়িয়ে বহুদূরের জিনিস নিয়েও জিজ্ঞাসা তৈরি হলো। দিগন্ত জোড়া জিজ্ঞাসা। বেঁচে থাকাটা মাঝে মাঝে বিস্ময়ের মনে হতে থাকল। এই বিস্ময় পুঁজি করে ধর্মের নিগড় গড়ে তুলল একদল মানুষ। এই বিস্ময়ের পিপাসা কিছু মানুষকে যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে নানা উত্তর বের করতে আগ্রহী করে তুলল। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তৈরি হলো, পাশাপাশি বিজ্ঞানও তৈরি হতে থাকল।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সিংহভাগ জুড়ে রইল এক প্রশ্ন, জীবন কোত্থেকে এসেছে? জীবনের কথা কম বেশি জানা হলেই তো নিজের সব ধর্মের কথা জানা হয়ে যায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অন্দরের দিকে তাকাতে হয়। বিজ্ঞানীরা সেই কাজ হাতে নিয়েছেন। একের পর এক অজানা পৃথিবীতে পা রেখে সেই পৃথিবীর ধারাভাষ্য মানুষদের শুনিয়েছেন।

বিশ শতক শেষ হয়ে একুশ শতক আসছে যখন, পৃথিবীর নানা কোণে নানা উৎসবের সমারোহ দেখা যায়। গণমাধ্যমের দলগুলো নানা প্রশ্ন আর বাকবিতণ্ডায় নেমে পড়ে। ব্রিটিশ ব্রডকাসটিং কর্পোরেশন (BBC) দুনিয়া জুড়েই কিছু সফল মানুষের কাছে নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন হাজির করে। সেই প্রশ্নের ঝুড়িতে একটা জিজ্ঞাসা ছিল, গত একশো বছরের সবসেরা আবিষ্কার কি? সবসেরা আবিষ্কার! মাত্র একটার কথা মনে করে তাকে শীর্ষস্থানে রাখতে হবে? বিজ্ঞানের সবচেয়ে বেশি দাপট গত শতকেই দেখা গিয়েছে।

এমন ঝাড়লণ্ঠনের ভেতর একটা আলো আলাদা করা যায় নাকি? তবু নানা জন নানা উত্তর রাখেন। নানা মজার উত্তরও তৈরি হয়। সেসবে আমরা যাচ্ছি না। বেশির ভাগ মানুষ বলেন, ডিএনএ দেখতে যে দ্বিতন্তুর মতন– এই গড়ন আবিষ্কার গত একশো বছরের সবসেরা কাজ। বলা নেই, কওয়া নেই– এমন করে ডিএনএ-র জগতে ঢুকে পড়া যায় না। একটু ভূমিকা সবাই চাইবে তোমরা। সেই ভূমিকা দিয়ে শুরু করি। জীবনের ভূমিকা। জীবন যা দিয়ে তৈরি তার নাম কোষ। প্রাণিদেহের

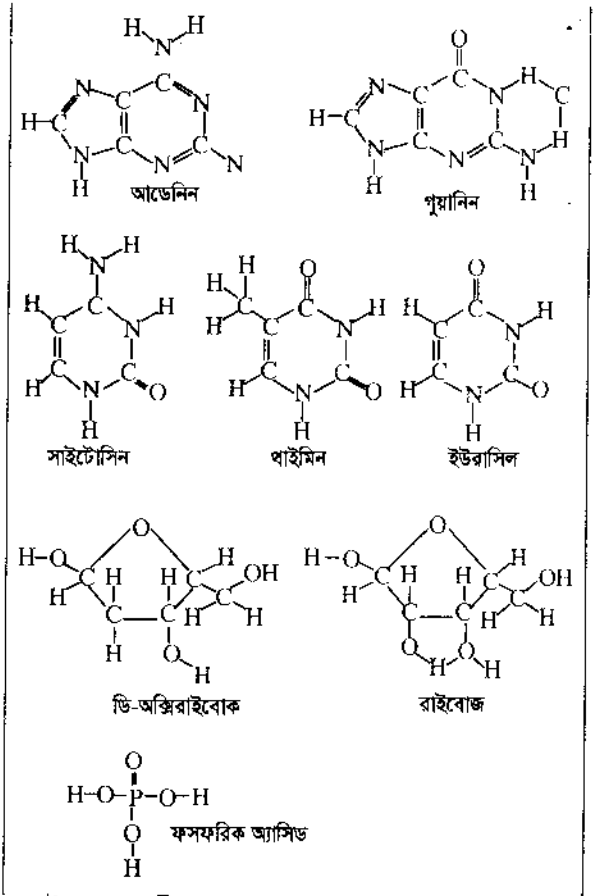

প্রাণী দেহও অনেক রকমের কোষে তৈরি। উদ্ভিদদেহের জীবন এক রকমের কোষে তৈরি। অনেক কিছুই মিল রয়েছে দুয়ের। অনেক কিছুতে আবার মিল নেই। সেই মিল অমিলের হিসেবে যাচ্ছি না। কতরকম সম্পদ সাজিয়ে বসে আছে কোষের অন্দর মহল। সেই অন্দর মহলে রয়েছে আরও নানা কুঠুরি। রাজা থাকেন যেখানে, সে জায়গাটায় যাওয়া সহজকর্ম নয়। কোষের মধ্য এলাকা, রয়েছে নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের কি থাকে? মানুষ জেনেছে একদিন, ক্রোমোজোম থাকে। জোড়ায় জোড়ায় থাকে। একটা জীবন প্রজাতির কত জোড়া ক্রোমোজোম থাকবে, তা ঠিক হয়ে আছে। কি করে ঠিক হয়ে আছে? কেন মানুষের একরকম? কেন গরু, ভেড়া, শ্যাওলা, বটের অন্যরকম? সব কথা আজও জানা যায়নি।

ইঁদুরের উনিশ জোড়া ক্রোমোজোম আর মানুষের তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম হলো কেন– একথা আজও মানুষ বের করতে পারেনি। তবে যা রয়েছে, তাকে দিয়ে মানুষ জ্ঞান ভাণ্ডার অফুরান আকারে তৈরি করে চলেছে।

ক্রোমোজোমে থাকে কি? নিউক্লিক অ্যাসিড। নিউক্লিক অ্যাসিডের গায়ে লেগে থাকে লাড্ডুর মতো হিস্টোন আর প্রোটামিনের দল।

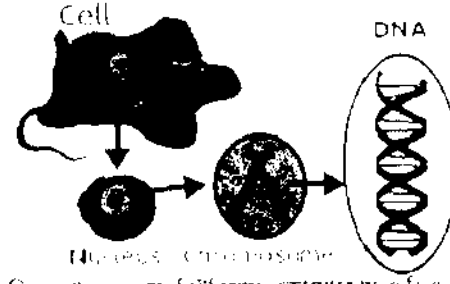

চিত্র : জীবের কোষ, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম ও ডিএনএ

হিস্টোন আর প্রোটামিন কি? একরকমের প্রোটিন। প্রোটিন কি? লম্বা লম্বা, কিছু খোলা কিছু জড়ানো পাকানো অণুর দল। যা দিয়ে তৈরি, এদের নাম অ্যামিনো অ্যাসিড। এইটুকুই থাক এখন। এবার নিউক্লিক অ্যাসিডে যাই। এই নিউক্লিক অ্যাসিড সুতোর মতো লম্বা। প্রোটিনের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা। চার রকম জিনিসে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি। এদের চলতি কথায় আমরা 'বেস' বলি। নিউক্লিক অ্যাসিড জীবনের কোষে দু'রকমের থাকে। রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড আর ডি-অক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। পাঁচ কার্বন দিয়ে সুগার, ফসফেট আর চার রকমের 'বেস' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বসে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি করে। এতো সব খবরাখবর শার্গভি নামের এক বিজ্ঞানী আমাদের জানিয়েছিলেন। আরউইন শার্গভি (১৯০৫-২০০২) ইউরোপ থেকে চলে গিয়ে আমেরিকায় গবেষণা জীবন শুরু করেন। ভিয়েনা, ইয়েল, বার্লিন, প্যারিস– সারা পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাচর্চা করেছেন।

১৯৩৫ সাল থেকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। কি অসামান্য সব উদ্ভাবনা তাঁর কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। শুধু জুড়লাম সেই কথা তবেই উদ্ভাবন। কি করে? একটা জীবনকোষে নানা রকমের আর.এন.এ. থাকতে পারে, ডিএনএ কখনো এক ধরনের বেশি হবে না।

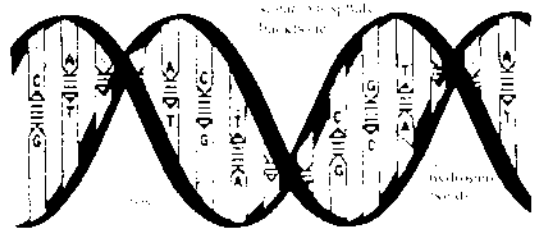

কোন প্রজাতির ডিএনএ আর কোন প্রজাতির সাথে মিলবে না। চার রকমের 'বেস'– অ্যাডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন আর সাইটোসিন– তিনিই দেখিয়েছেন। এদের ছোট্ট করে আমরা A, T, G, C বলি। সারা পৃথিবী একসময় তাঁর উদ্ভাবনা আগ্রহ নিয়ে দেখেছে। বললেন শার্গভই- এই A, T, G, C এর একটা মজার সম্পর্ক আছে। A = T হয়, G = C হয়। অ্যাডেনিন আর থাইমিন সমান সংখ্যায় থাকে। গুয়ানিন আর সাইটোসিন সমান সংখ্যায় থাকে।

ডিএনএ-র ভেতরে কি থাকে না থাকে এই নিয়ে প্রচুর তথ্য আমাদের উঠে আসছিল। জানা যাচ্ছিল না, আরও গভীর দু'একটা কথা। ডিএনএ-র চেহারাটা কেমন। টুকরো টুকরো খবরে পুরো হাতির ছবি দেখা যায় না। জুড়তে হয়। যেখানে যার থাকার কথা, সেখানে তাকে রেখেই জুড়তে হয়। তারপর ছবিটা দেখে বোঝা যায় কেমন দেখতে কি তৈরি হলো। শার্গভি সারা জীবনে দু'শোরও বেশি গবেষণাপত্রে ডিএনএ নিয়ে করেছেন। তাঁর

কথা না ভেবে আমরা ডিএনএ দেখতে কেমন বার করতেই পারবো না। দেখতে কেমন জানার আগ্রহ অন্য কারণে। কোষের কে আমাদের জীবন প্রবাহ আর বংশগতি অক্ষুণ্ন রাখে? জানতে চাই আমরা। এই যে সব জীবন তার সন্তানসন্ততি রেখে যেতে চায়, সেই চাওয়া হাজার হাজার বছর ধরে সার্থকভাবে বেঁচে থাকছে কি করে? এমন প্রশ্নের গভীরতা নিয়ে কারও কোন সন্দেহ তৈরি হয় না। শুধু প্রশ্নের উত্তর পেতে সারা পৃথিবীর মানুষ উন্মুখ হয়ে ছিল। কেউ কি দিতে পেরেছেন এই জবাব? পেরেছেন। একজন ওয়াটসন, অন্যজন ক্রিক, জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক। ওয়াটসনের বাড়ি আমেরিকা, ক্রিক ইংল্যান্ডে থাকেন, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম তোমরা শুনেছ। পৃথিবীর সেরা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম। তারও সবসেরা গবেষণাগারের নাম ক্যাভেনডিশ গবেষণাগার। ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারে, পৃথিবীর কতো যে মৌলিক উদ্ভাবনা ঘটেছে, সেই ইতিহাস বলে শেষ হবার নয়। সেই গবেষণাগারের অভিভাবক বলতে গেলে নোবেলজয়ী ছাড়া কেউ হননি। ক্রিক যখন গবেষক, তখন ক্যাভেনডিশের অধিকর্তা নোবেলজয়ী ব্র্যাগ। যাই হোক, আমরা ধীরে ধীরে ওয়াটসন ক্রিকের কাজের কথায় আসব। গভীর জিজ্ঞাসা রয়েই গিয়েছিল দুনিয়ায়। গাছ থেকে গাছ হয়। ইঁদুর থেকে ইঁদুর, মানুষ থেকে মানুষই হয়। এখন এতো সহজ লাগে, মনে হয় ভবিষ্যত কোন কারণ থাকবে না? কারণ ছাড়া ভবিতব্য হবে কেমন করে? সূর্যমুখীর ফুল কখনও রজনীগন্ধার রঙ ধরছে না। রজনীগন্ধার গন্ধ কখনও সূর্যমুখীর মত হচ্ছে না। কেন এমন? এই জিনিস জানতে চেয়েছে মানুষ।

চিত্র : জেমস ওয়াটসন ও ফ্রান্সিস ক্রিক

ফ্রান্সিস ক্রিক বয়েসে বড় (১৯১৬-২০০৪)। তাঁর কথাই আগে বলব। বাবা স্থানীয় গির্জার সম্পাদক ছিলেন। এমন আহামরি কেউ ছিলেন না। বাবার এমন কাজ, ছেলেকে গির্জায় নিয়মিত প্রার্থনায় যেতে হয়। যেতেন প্রার্থনার সময় ঈশ্বরচিন্তা বাদ দিয়ে বাকি সব চিন্তা ঘুরে বেড়াত। অনেককাল আগে গ্যালিলিওর গল্প আমরা ছোটবেলায় পড়েছিলাম। গির্জায় গিয়েছেন। ঈশ্বরচিন্তা কই? শেকল দিয়ে ঝোলানো বাতিটার দোলনকাল আর নিজের শিরার স্পন্দন মাপতে চাইছেন তিনি বারবার। বড়ো হয়ে চমৎকার বলেছেন ক্রিক, 'গির্জায় গিয়ে লাভ হয়েছে। রাগ থেকেই হয়তো বা যুক্তিহীনতার ব্যাপার স্যাপারগুলো মাথা থেকে ছোটবেলাতেই উধাও হয়ে গিয়েছে।'

ঈশ্বর নিবেদিত পরিবারে ব্যতিক্রম ছিলেন ক্রিক। ছোটখাট ব্যবসা ছিল একসময় তাঁদের। দাদু ওয়াল্টার ক্রিক একসময় একটা জুতোর কারখানার পরিচালক ছিলেন। ১৯০৩ সালে মাত্র ছেচল্লিশ বছর বয়েসে দাদু মারা যান। দাদু মারা যেতে বাবা হ্যারি ক্রিক আর এক কাকা এই কারখানা দেখাশোনা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলো একসময়। বহু ব্যবসা ডুবে গেল ইউরোপে। জুতোর কারখানা চালানো গেল না। বাবা আর ক্রিক ওখানেই রইলেন। চাচা আমেরিকায় চলে যান। নানা জুতোর কারখানায় কাজ করেন। বাবা হ্যারি ছেলেকে নিয়ে লন্ডনে চলে যান। ছোট জুতোর দোকান খুলে কেনাবেচা করতে থাকেন। খারাপ চলে না। কারখানার মালিকের মত আর চলবে কি করে। ক্রিকেরা দু'ভাই। ফ্রান্সিস আর অ্যান্টনি। লন্ডনের মিল হিল স্কুলে পড়েছেন। ভালো স্কুল। মিল হিল থেকেই ১৯৩৪ সালে ফ্রান্সিস পাশ করেন। কেমন ছিলেন ছোটবেলায় ক্রিক? স্কুলের হেডমাস্টারমশাই বলছেন, 'ভালো ছেলে ছিল। তবে জোরে জোরে হাসত, কথাও বলতো বোধহয়

একটু বেশি।' এই সুনাম (না কি অপবাদ?) তাঁর জীবনে কখনো ঘুচেনি। অট্টহাস্যের মানুষ কে? ক্রিক। বকবক করেই চলেছে কে? ক্রিক। ক্যাভেনডিশের ঘরে ঘরে এমন একটা কানাঘুষো বরাবরই শোনা যেত।

স্নাতক হয়ে ক্রিক ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ লন্ডনে চলে যান। বিজ্ঞানে বরাবরেরই আগ্রহ। বিজ্ঞান নিয়েই পড়লেন। পদার্থবিদ্যায় ভর্তি হলেন। একটু খারাপ খবর ছিল। পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি পেতে পারলেন না। একটু খারাপ বলছি কেন? প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় শ্রেণি, এগুলো খুব অল্পসময়ের বিষয়। কেউ যদি পড়ে আর কাজ না করতে পারে, পৃথিবীতে নতুন কিছু দিতে না পারে, 'শ্রেণি' দিয়ে হবেটা কি? আজ ক্রিক এমন উচ্চতায়, কেউ ভুলেও মনে করে না যে তিনি 'দ্বিতীয় শ্রেণি' পেয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালে লন্ডন থেকে পাশ করেন। প্রথম পরীক্ষার বিষয়টা তাঁর মজার ছিল। পানি কেমন তরতর করে বয়ে চলে, সান্দ্রতা কম বেশ। বেশ সান্দ্রতা কম– এই নিয়ে কাজ করতে হবে। অতি উঁচু তাপমাত্রায় জলের সান্দ্রতাধর্ম কেমন পাল্টায় দেখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার মুখে। তিনি দু'বছরের মাথায় তাঁর কাজ শেষ করেন। টেডিংটনে গিয়ে অ্যাডমিরালটি গবেষণা কেন্দ্রে যোগ দেন। যুদ্ধবিবাদ বাদ দিয়ে তখন আর কোন গবেষণা হবে না। তাঁকে একটা কাজ দেওয়া হলো। সাবমেরিনে যাবেন যারা যুদ্ধ করতে, তাদের হাতে আরও ভালো মানের 'মাইন' দিতে হবে। বিজ্ঞানীরা খবর পেয়েছেন। জার্মানি গবেষকদল 'অ্যান্টি-মাইন' তৈরি করেছেন। এমন মাইন তৈরি করতে হবে, জার্মান বুদ্ধি সেখানে কোন কাজেই লাগবে না।

ক্রিক কাজে অসাধারণ। করে ফেললেন তেমন মাইন। একা একাই। আর সবাইকে দরকারও হলো না।

যুদ্ধ শেষ হলো। কোথায় যাবেন ক্রিক? অ্যাডমিরালটিতেই থাকতে চাইলেন। লন্ডনের নৌ গবেষণাকেন্দ্রে গবেষণা করবেন ভাবলেন। তবে যুদ্ধ গবেষণা নয়। পদার্থবিদ্যার জগতে ডুবে যেতে চান।

পদার্থবিদ্যার কথা ভেবেও কেমন যেন তাঁর ভাবনা জীববিদ্যার দিকে চলে যায়। একটু বেঢপ ঠেকে। পদার্থবিদ্যার ডক্টরেট, ওইদিকে গেলেন কেন? এখন এমন প্রশ্ন কেউ করেন না। হামেশাই এমন হচ্ছে। বিষয়ইতো রয়েছে জীবপদার্থবিদ্যা। চারের দশকে লোকেরা অবাক হত।

ক্রিক নিজে কি বলেছেন এই নিয়ে, আমরা একবার দেখি। কারণগুলো বিস্ময়ের মনে হবে খানিকটা। 'ভাইটালিজম' এর তত্ত্ব তাঁর একেবারেই অপছন্দের ছিল। চোখের সামনে যা দেখছি তার বাইরে কিছু থাকতে পারে না। পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সাহায্য নিয়ে জড় ও জীবন, উভয়েরই খবর জানানো যায়। জীবনের জটিল ধরন বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবু বলেছেন, জটিল জিনিস জানতে জগতে সময় বেশি লাগতে পারে।

জীবনের আঙ্গিনায় গবেষণা করার আগ্রহ আরও একটা কারণেও তাঁর তৈরি হয়েছিল। ডারউইন শ্রয়ডিঙ্গার বই লিখেছিলেন 'হোয়াট ইজ লাইফ?'। অস্ট্রিয় পদার্থবিদ শ্রয়ডিঙ্গার। ১৯২৬ সালে কোয়ান্টাম বিদ্যায় অসামান্য গবেষণা করে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই বইয়ে যা লিখেছেন শ্রয়ডিঙ্গার, ক্রিক পুরোপুরি একমত। ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনাবলী থেকেই জীবনের সকল আচার আচরণ উপলব্ধি করা যায়।

ঠিক করে ফেললেন ক্রিক। জীববিদ্যার গবেষণায় যাবেন। ১৯৪৭ সালে ইংলিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলে চিঠি পাঠালেন। এই শাখায় কাজের আগ্রহ কেন তার? দরখাস্তে চমৎকার ভাষায় সেসব কথা সাজালেন।

ডাক পেলেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাঞ্জওয়েজ ল্যাব-এ গবেষণা শুরু করেন। কোষ নিয়ে কাজ। কাজের ফাঁকে ভাবছিলেন, পদার্থবিদ্যার পরিকাঠামো গবেষণায় বেশি কাজে লাগাতে পারছেন না। কেমব্রিজে তখন অস্ট্রিয় বিজ্ঞানী ম্যাক্স পেরুজের তত্ত্বাবধানে জৈবিক অণুর কেলাস নিয়ে এক্স-রশ্মি বিচ্ছুরণ পরীক্ষা হচ্ছিল। এই পরীক্ষার উপায় যারা উদ্ভাবন করেছেন, তাঁরাও তখন কেমব্রিজেই রয়েছেন। বাবা হেনরি ব্র্যাগ ছিলেন না। পুত্র লরেন্স ব্র্যাগ অধিকর্তা ছিলেন। পেরুজ সেখানেই কাজ করতেন। এক্স-রশ্মি পরীক্ষা থেকে যে ছবি তৈরি হয়, তার বিবরণ পাঠ করতে জানতে হয়। সোজা সরল অণু হলে একরকম। জীব অণুর বিষয়টা আলাদা। একটু জটিলতা থাকেই। একটা জটিল জৈব অণুর কেলাস তৈরি করাটাও একসময় খুব সোজা ছিল না। অনেকে মনে করতেন, অতো বড়ো বড়ো অণুর কেলাস হয় না। সামনার যখন ইউরিয়েজের কেলাস পেলেন, দুনিয়ায় অনেকে সেদিন মানতে চাননি।

যাই হোক ক্রিক পেরুজের দলে কাজ করতে চাইলেন। পেরুজ নিজেও এমন একজন লোকই খুঁজছিলেন। মানে? যিনি পদার্থবিদ্যা জানবেন, জীববিদ্যাও একটু আধটু জানবেন। বংশগতি নিয়ে গবেষণা করতে চাইলে

এই ধারণা ছাড়া পেরুজের গ্রুপে যে ধরনের কাজ করতে অসুবিধে হবে [illegible] দানা বাঁধে কখন? যে সময় গ্রেগর যোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) তাঁর [illegible] কথা আমাদের জানিয়েছিলেন। সত্যিই কি তাই? আমরা কি সে সময় তাঁর [illegible] ছত্রিশ বছর ধরে তাঁর কাজ এক কোণে অবহেলায় পড়েছিল। ১৯০০ সালে [illegible] কাজের অসাধারণত্ব নজরে নিয়ে আসেন। ১৯০০ সাল। উনিশ শতক শেষ [illegible] প্লাঙ্কের কাজ তৈরি হয়েছে ওই বছর। ওই কাজের প্রভাব আগে আমরা বলেছি [illegible] সাল আলাদা ভাবনা যোগ করে। কায়িক শ্রম আর সময় কাজে লাগিয়ে মেন্ডেল [illegible] মটরগাছের উপর পরীক্ষা করেছেন। মটরগাছের নানা বৈশিষ্ট্য কেমন করে [illegible] দেখিয়েছেন। কারণ কি? একগাছ থেকে 'ফ্যাক্টর' অন্য গাছে যায়। এই 'ফ্যাক্টর' [illegible] ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। তখন কে আর ক্রোমোজোম শুনেছে! 'জিন' ও [illegible] তৈরি হয়নি। সাধারণ ঘরের ছেলে ছিলেন মেন্ডেল। বাবার সামান্য জায়গাজমি ছিল। [illegible] বছরের তরুণ, বাবার এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। কাজের জগত থেকে সরে যেতে হয়। [illegible] পড়ে। শিক্ষকতা শুরু করেন। নিজের পড়াশুনোইতো শেষ হয়নি। শেখাবেন কি? [illegible] আবার শিক্ষকতায় যোগ দিলেন।

'বংশগতির বাহক' হিসেবে বিজ্ঞানীরা একসময় প্রোটিন চিহ্নিত করেছিলেন। কারও চুল কুচকুচে কালো। কারও লালচে। কারও আবার সাদা হয়ে যায়। সব কিছু প্রোটিন দিয়েই হয়। 'কালো' চুলের এক প্রোটিন, 'লাল' চুলের এক প্রোটিন এইরকম। পৃথিবীর জীবজগতের যা লক্ষ কোটি বৈচিত্র্য, তাকে সামাল দিতে এমন অণুই তো চাই যারা সংখ্যায় লক্ষ কোটি। পৃথিবীতে প্রোটিন কতরকমের হতে পারে? ২৪×১০^{১৭}; তবে 'প্রোটিন' আর 'বংশগতির চরিত্র' সমার্থক হতে ক্ষতি কি?

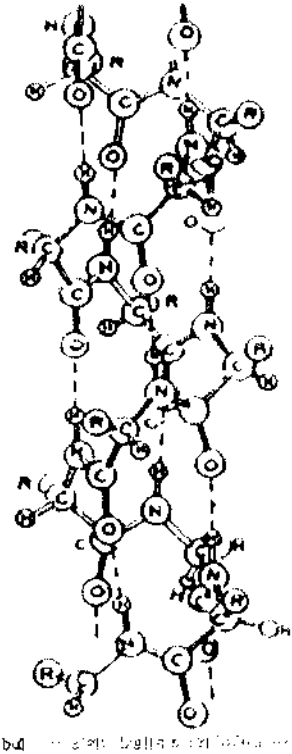

চিত্র [illegible]

লাভ-ক্ষতি বলা মুশকিল। কথাটা যে পরে ধোপে টেকেনি, সে আমরা দেখব। রসায়নবিদেরা কত কি হন্যে হয়ে খুঁজেছেন, লাভ হয়নি কিছু। একসময়ে কাজ করেই তো বিজ্ঞানীদের এই সারৎসার বের করতে হয়েছে। পেরুজের দলে যোগ দিলে এমন কাজের অংশীদার হতে পারবেন ক্রিক। ১৯৪৯ সালে স্ট্যাঞ্জওয়েজ ল্যাব ছেড়ে কেমব্রিজের ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারে যোগ দিয়েছেন। কোষ গবেষণায় বায়োলজি বেশি ছিল। পেরুজের দলে ফিজিক্সশিস্ট বেশি-- একটু তুলনামূলকভাবে খুশিই হলেন।

তোমরা হিসেব করে দেখে নাও। যখন পেরুজের সাথে যোগ দিয়েছেন ক্রিক, বয়স তাঁর তেত্রিশ। ডক্টরেট করার দরখাস্ত জমা দিয়েছেন। এই বয়সে কে বাইরের বা আমাদের দেশে ডক্টরেট হবার দরখাস্ত করে? ক্রিক চাইলেন। কেমব্রিজেই দরখাস্ত জমা দিলেন। প্রথম একবছর 'এক্স-রশ্মি কেলাসবর্ণালীবিদ্যা' নিয়ে লেখাপড়া করেছেন। একবছর পর সেমিনার দিতে হয়। দিলেনও। ব্র্যাগ, পেরুজ, আরও এক সহকর্মী কেনড্রু শুনলেন। খুঁত ধরতেই ক্রিক বেশি ওস্তাদ। সবসময়ে কি রেখে ঢেকে [illegible] যখন এমন, ওয়াটসন সেখানে যেন বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। পনেরো বছরে [illegible] শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে এলেন। চারবছর ছিলেন। দর্শন ও বিজ্ঞান– উভয় বিষয়ে [illegible] করেন। তাঁর বিষয়ে শিক্ষকেরা খুবই উচ্ছ্বসিত। পল ভেইস নামকরা শিক্ষক [illegible] কখনও ক্লাসে নোট নিতে দেখিনি। তবু পরীক্ষায় ও ছাড়া কেউই প্রথম হতো না।

ওয়াটসনের পরিবারও মধ্যবিত্ত ছিল। বাবা ছোটখাট ব্যবসা করতেন, আর সেই আমলে একটা করসপন্ডেন্স স্কুল চালাতেন। বাবাকে ছোটবেলায় ওয়াটসন বলতেন, 'অতো চাপ নাও কেন, স্কুলে পড়াও শুধু। অনেক ভালো থাকবে।'

তবে ওয়াটসনের মা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরতা ছিলেন রাজনীতি করতেন বাবা মা দু'জনের কারও ধর্মীয় ভাবনার বাড়াবাড়ি ছিল না। ১৯২৮ সালের ৬ই এপ্রিল ওয়াটসনের জন্ম হয়। ভালো ছাত্র আগেই বলেছি। কুইজ দলে তাঁর নাম থাকতোই। ১২ বছর বয়েসে রেডিওতে অনুষ্ঠান করেছেন। কি হতে চাইতেন ছোটবেলায় ওয়াটসন? বাবার পাখি দেখার শখ ছিল। বাবার সাথে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতেন বন্ধুদের বলতেন, 'একটা পাখির সংগ্রহশালায় কিউরেটরের কাজ পেলে আমার আর কিছু চাই না।' পক্ষীবিদ্যার একটা ছোট কোর্সেও ভর্তি হয়েছিলেন ওয়াটসন।

একটা কাকতালীয় ঘটনার কথা বলা যেতে পারে। ক্রিক যেমন শ্রয়ডিঙ্গারের বই পড়ে প্রেরণা লাভ করেন, ওয়াটসনের বেলাতেও একই বই একই মনোভঙ্গী তৈরি করেছে। আশ্চর্য নয় কি? একজন আমেরিকা মহাদেশের, অন্যজন ইউরোপ মহাদেশের লোক বইটা ভালো বুঝি। পরের জীবনে একসাথে কাজ করলেন, একই বই তাঁদের বিজ্ঞান সাধনায় প্রেরণা জুগিয়েছে– ভাবতে কেমন অবাক লাগে। ইচ্ছে, গবেষণা করবেন। হার্ভার্ড ও ক্যালটেক দুই জায়গাতেই দরখাস্ত করেন। কেউ তাকে নিতে রাজি হয়নি। তিনি এরপর ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন।

ইন্ডিয়ানার দরখাস্তে ওয়াটসন জানালেন, পক্ষীতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করবেন। কোথায় করবেন? ইন্ডিয়ানায় এমন কোন বিষয় নেই। ডিন জানিয়ে ছিলেন চিঠি দিয়ে, 'যদি সত্যি সত্যি তাই চাও, তবে অন্য কোথাও চেষ্টা কর। আমাদের এখানে হবে না।' ইন্ডিয়ানায় তখন সবচেয়ে বিখ্যাত যিনি রয়েছেন, তাহার নাম হার্মান মুলার। ১৯৪৬ সালে জিনের উপর এক্স-রশ্মির প্রভাব নিয়ে কাজ করে নোবেল পেয়েছেন। ওয়াটসন চাইলেন, সেখানে কাজ করবেন। নয়শো ডলার বৃত্তি। ১৯৪৭ সাল থেকে কাজে লেগে গেলেন। মুলার যে কাজ করেন, ড্রসিফিলা ছাড়া চলে না। অতোটা বায়োলজি করতে তাঁর ইচ্ছে ছিল না। একটু ভৌত বিজ্ঞানের কাছাকাছি থেকে 'জিন' বুঝতে চাইছেন। তেমন পেলে ভালো হত।

যাই হোক, ব্যাকটেরিওফেজ নিয়ে কাজ শুরু করলেন ওয়াটসন। কারা ব্যাকটেরিওফেজ? এক ধরনের ভাইরাস যারা ব্যাকটেরিয়া কোষের ভেতর ঢুকে তাকে ধীরে ধীরে মেরে ফেলে। এই নিয়ে তখন কাজ হত অনেক। কারণ অনেকেরই মনে হত, জিন ও বংশগতি বুঝতে চাইলে ব্যাকটেরিওফেজ খুব কাজের হবে। কেন মনে হত? কারণ অনেকেই তখন ভাইরাসকে 'সাদামাটা জিন' ছাড়া কিছু ভাবতেন না। ভাইরাস কেমন জানো তো? খানিকটা বড়। খানিকটা জীবন। একটা ভাইরাস নিজে নিজে কখনও বাড়তে পারে না। ব্যাকটেরিয়ার ভেতর ঢুকতে হয়। ব্যাকটেরিয়ার শরীরে ঢুকে গিয়ে সংখ্যায় বাড়ে। এই বিষয়ের উল্লেখ্য দু'জন মানুষ সেসময় ইন্ডিয়ানায় গবেষণা করতেন। একজন সালভাতোর লুরিয়া'। অন্যজন ম্যাক্স ডেলব্রুক। লুরিয়া ইতালির বিজ্ঞানী। চিকিৎসাবিদ্যালয়ে ডিগ্রি নিয়ে আমেরিকায় চলে এসেছিলেন। ডেলব্রুক জার্মান বিজ্ঞানী। তিনি ১৯৩৭ সালে আমেরিকায় চলে আসেন। ওয়াটসন ডেলব্রুকের নাম আগেই জানেন কেমন করে? শ্রয়ডিঙ্গারের বইতেই ডেলব্রুকের নাম রয়েছে আগেই তিনি পড়েছেন।

ডেলব্রুক যেভাবে কাজ করেছেন, একজন ভৌতবিজ্ঞানী এভাবেই কাজ করবেন। নীলস বোরের ছাত্র ছিলেন ডেলব্রুক কথায় কথায় একদিন বোর ডেলব্রুককে বলেছিলেন, 'অণুর কাছাকাছি চলে যাও। দেখবে অজৈব আর জৈব চেহারায় বিশেষ ফারাক বুঝতে পারবে না। রসায়ন আর পদার্থবিদ্যার একগুচ্ছ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া থেকে জীবনের নানা ধর্ম ব্যাখ্যা করা যায়।' জানানো বোধহয় কেউ কেউ, লুরিয়া আর ডেলব্রুক নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন।

মুলারের কাছ থেকে ওয়াটসন লুরিয়ার কাছে চলে এসেছিলেন। খুব উঁচু মানের গবেষণা করতে পারেননি, তবে তিন বছরের কাছে ডক্টরেট ডিগ্রি হয়ে গিয়েছে। বাইশ বছর বয়সে ১৯৫০ সালের মে মাসে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

জেনেটিক কণা হিসেবে প্রোটিনের পক্ষে সওয়াল করছিলেন সবাই— একথা আমরা আগে বলেছি। কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডের খবর বেরোবার পর কেউ কেউ দেখে নিতে চাইলেন, কোষের মধ্যমণি হয়ে বসে থাকা নিউক্লিয়াসেরও যে মধ্যমণি, তার তবে কাজ কি?

১৮৬৮ সালে নিউক্লিক অ্যাসিডের সন্ধান দেন সুইস রসায়নবিদ যোহান ফ্রিডরিচ মিশার। মিশার এদের বলেছিলেন 'নিউক্লিন'। নিউক্লিক অ্যাসিড কি জেনেটিক কণা হতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে। এমন একটা অনুমানের কথা প্রথম আমাদের শুনিয়েছিলেন যিনি, নাম তাঁর অস্কার হার্টভিগ। ১৮৮৪ সালে বললেন, 'নিউক্লিন শুধু নিষেকেই সহায়তা করে না, বংশগতির চরিত্র রক্ষাতেও তার ভূমিকা রয়েছে বলেই মনে হয়।'

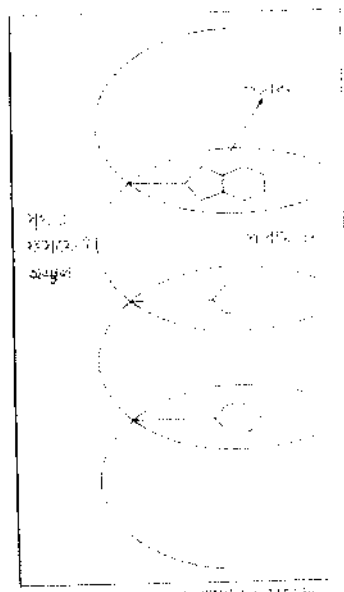

চিত্র : [illegible] পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে

কারও কারও বিষয়টা মানতে ইচ্ছে করেনি। কেন? সোজা সরল অণু নিউক্লিক অ্যাসিড। প্রোটিনের তুলনায় সোজা সরল নয়তো কি? আছে শুধু পাঁচ কার্বনের সুগার, ফসফেট আর চাররকমের বেইস। প্রোটিন সেখানে কেমন বৈচিত্র্যময়। কুড়ি রকমের অ্যামিনো অ্যাসিডতো রয়েছেই। প্রোটিনের সাথে কতোরকমের অণুওতো লেগে থাকে। শার্গভের কথাও আমরা আগে বলেছি, তবে তার আগে বোধহয় আর একজন মানুষের কথা বলা ভালো। আজকাল তিনি বেশি আলোচিত হন না। নাম তাঁর ফোয়েবাস লেভিন (১৮৬৯-১৯৪০)। সোভিয়েতে জন্ম। বাবা ইহুদি। জামাকাপড়ের দোকান ছিল। ছেলে লেভিন মেডিক্যাল একাডেমিতে ভর্তি হয়েছিলেন। পাভলভের ছাত্র ছিলেন। বোরোদিন রসায়ন পড়াতেন। বোরোদিন তাঁকে গবেষণার কাজে ভীষণ উৎসাহিত করেছিলেন। ফলে লেভিন চিকিৎসাবিদ্যা ছেড়ে রসায়নে মনোযোগী হন। ১৮৯১ সালে লেভিন ও বাবা মা সবাই মিলে আমেরিকায় চলে আসেন। রুশ-ইহুদিদের কলোনিতে চিকিৎসা করতেন।

১৯০০ সালে নিজের জীবিকা ছেড়ে দেন লেভিন। বার্লিনে এমিল ফিশারের কাছে কাজ করেন এক বছর। খুব বড়ো মাপের রসায়নবিদ এমিল ফিশার। ১৯০৫ সালে রকেফেলার মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটে যোগ দেন। নিউক্লিক অ্যাসিডের একরকম সুগার যে রাইবোজ তিনিই প্রথম দেখান। দ্বিতীয় সুগারের সন্ধান পেতে আরো বিশ বছর কেটে যায়। কারণ কিছুই না। অ্যাসিড দিয়ে নিউক্লিক অ্যাসিড ভাঙতে গেলেই ডি-অক্সিরাইবোজ ভেঙ্গে যায়। লেভিন-ই বিশ বছর পরে এই দ্বিতীয় সুগার বের করেন। যে পরীক্ষা থেকে জানা যায়, এই তার জটিলতা কল্পনা করা যায় না। দু'খানা সুগার জানলাম। এতে খুব বেশি কি লাভ হলো? পৃথিবী প্রথম জানতে পেল, দু'রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড রয়েছে। রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড আর ডি অক্সি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। এর আগে বলতেন সবাই, নিউক্লিক অ্যাসিড। যাঁরা অনেক ঠিক কাজ করেন, ভুল কাজও একটা/দুটো করেন। চারটে 'বেস' ডেকে এনে নিউক্লিক অ্যাসিডের একটা গড়নের কথা বলেছিলেন লেভিন। আজ জানি আমরা। এরকম নিউক্লিক অ্যাসিড পৃথিবী কখনও তৈরি করেনি।

১৯৪৪ সালে অ্যাভারির পরীক্ষা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। কাজ করেছিলেন তিনজন। অ্যাভারি, ম্যাকলিয়ড আর ম্যাকার্থি। ওই পরীক্ষাই আমাদের প্রথম দেখায়, ডিএনএ বংশগতির ধারক ও বাহক হিসেবে কাজ করে। এই জিনিসের সমর্থন পেতে খুব কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছে তাঁদের। কেউই প্রায় জেনেটিক কণা হিসেবে 'নিউক্লিক অ্যাডিস' কে মানছেন না। প্রোটিনের জয়গান গাইছেন। হাতেনাতে জয়গান করলেও পরীক্ষা করে না দেখালে পৃথিবীতে কেউই মানবে না। যাঁরা মানেননি, সেইদলে অন্তত দু'জন ছিলেন। ফ্রান্সিস ক্রিক ও জেমস ওয়াটসন। ওঁরা ডিএনএর ক্ষমতা অনেক আগেই বুঝতে পারেন। ডিএনএ ভাঙচুর করে কাজ করতে হবে। ওয়াটসন এই বিষয়ে অচল। রসায়ন তাঁর ভালো লাগে না। রসায়ন নিয়ে পড়েনওনি। একদিন ওয়াটসন ল্যাবে একটা তরল নিয়ে খুব বেশি তাপে ফুটাচ্ছিলেন। তরলটা সাদামাটা নয়। একটু আঙুরের

ছোঁয়া পেলেই দপ করে জ্বলে ওঠে। মাস্টারমশাই দেখে চমকে গেলেন। ভয়ও পেলেন। [illegible] ওয়াটসনকে ডেকে বললেন, 'হাত পা পুড়ে মরো না, তার চেয়ে কিছু জেনে কিছু না জেনে ডক্টরেট হয়ে [illegible] সেও ভালো'।

কোথায় যাবেন ওয়াটসন? কোপেনহেগেনে গেলেন। ওখানে রয়েছে হার্মান কালকার। ডেলব্রুকের কাছে [illegible] করছিলেন। এখন ব্যাকটেরিওফেজ আর নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করেন। তিন হাজার ডলারের ফেলোশিপ পেলেন। ডেনমার্কে কি করেছেন ওয়াটসন? ওয়াটসন নিজে বলেছেন, 'কমপ্লিট ফ্লপ'। কিছু হয়নি। আবহাওয়া ভালো লাগত না, বুদ্ধিমান লোকও নাকি বেশি পেতেন না। বোকা বোকা আবহাওয়ায় আর কতটা কাজ [illegible] যায়? কালকারও নিজে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে ছিলেন। ওয়াটসনকে কিছুই দেখাতে পারেননি।

এদিকে একটা সম্মেলনে লন্ডনের অধ্যাপক মরিস উইলকিনস-এর সাথে দেখা হয়। এক্স-রশ্মি [illegible] অন্যতম ব্যক্তিত্ব উইলকিনস। লন্ডনের কিংস কলেজে কাজ করছিলেন। সম্মেলনে উইলকিনস [illegible] আজও ওয়াটসনের মনে পড়ে। বক্তৃতার ফাঁকে কয়েকটা ডিএনএ কেলাসের ছবি দেখালেন [illegible] ওয়াটসন। এমন জিনিসইতো তিনি খুঁজছিলেন এতোকাল ধরে। সম্মেলন শেষ হলো একসময়। [illegible] নিজের জায়গায় চলে গেলেন। উইলকিনস লন্ডনে ফিরে যান।

নিজের মতো করে ভাবছেন ওয়াটসন। একজনের কথা মনে পড়ে। তিনি লাইনাস পাউলিং [illegible] বিজ্ঞান ও চৈতন্যের অভিভাবক। দু'বার নোবেল পেয়েছেন। জীবনের শুরু থেকেই প্রায়, রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের [illegible] ঝগড়ায় লেগে আছেন। প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠনের আবিষ্কর্তা এই লাইনাস পাউলিং। প্রোটিনের পরমাণুগুলো একটা হেলিক্সের পথ ধরে উঠে। খুবই সাদামাটা একটা হেলিক্সের ছবি আমরা [illegible] দেখিয়েছি। পাউলিংকে অসামান্য শ্রদ্ধা করতেন ওয়াটসন। তাঁর নিজের লেখা 'ডাবল হেলিক্স' বই পড়লে [illegible] জিনিস ভালো করে জানতে পারা যায়। ঠিক করলেন লন্ডন যাবেন। কেমব্রিজে ম্যাক্স পেরুজ [illegible] বর্ণালীবিদ্যা' করছেন। তাঁর কাছেও যাবেন। লুরিয়াকে জানিয়ে ওয়াটসন কোপেনহেগেন থেকে তার ফেলোশিপ কেমব্রিজের ক্যাভেনডিশ গবেষণাগারে করে নিলেন। ট্রেন থেকে নেমে একটুও আর কোথাও অপেক্ষা নয়। সোজা পেরুজের কাছে হাজির হলেন ওয়াটসন।

ওয়াটসন আর ক্রিক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞান উদ্ভাবনার দুই চরিত্র। বি.বি.সি. সমীক্ষার কথা মাথায় [illegible] 'শ্রেষ্ঠতম' বললাম। প্রথম পাঁচ দশের মধ্যে তাঁদের কাজতো থাকবেই।

ক্রিকের বয়েস তখন কত? পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। ডক্টরেট করবেন বলে নাম লিখিয়েছেন। ওয়াটসন [illegible] বছরের যুবক। ডক্টরেট হয়ে গিয়েছে। বারো তেরো বছরের ফারাক। কাজ করতে কিছু অসুবিধে হয়নি। দু'চরিত্রের ভূমিকা ভিন্ন। একজন পদার্থবিদ্যার আলোকে ডিএনএ দেখতে চান, তিনি ক্রিক। একজন জেনেটিক্স-এর আলোকে ডিএনএকে বুঝতে চান, তিনি ওয়াটসন। এখন যে কাজে দু'জনে হাত দিতে চাইছেন, আগের তেমন অভিজ্ঞতা বলতে কিছুই নেই। কি অভিজ্ঞতা চাই? কেলাসের ধর্ম [illegible] অভিজ্ঞতা। বর্ণালী থেকে কেলাসের ধরন ধারণ ও গড়ন বের করার অভিজ্ঞতা। কিছু করার আগে [illegible] বিষয়ে এই দু'জন মানুষ একেবারে একমত। কি সেই অভিমত? বংশগতির নিয়ন্ত্রণে যার ভূমিকা [illegible] বেশি, সে ডিএনএ। ভাবলেই শুধু চলবে না। বের করে দেখাতে হবে।

ক্যাভেনডিশে ক্রিকের সাথে পরিচয় হতেই ওয়াটসন ভীষণ খুশি। কেন? তাঁর নিজের মতো [illegible] একজনকে পাওয়া গেল যে প্রোটিনের তুলনায় ডিএনএ কে বড়ো করে দেখছে। ঠিকই করে ফেলেছিলেন ওয়াটসন সেদিন। ক্যাভেনডিশ ছেড়ে বেশ ক'বছর তিনি কোথাও যাবেন না। ধাঁধার সমাধান না করে পালাবেন কেন? ওয়াটসন যেখানে বসতেন, ক্রিক সেখানে বসতেন না। দুপুরে খাবার খেতে যেতেন একাই

জায়গায়। সেখানে দু'জনের কথা হতো, দু'জনে কাজ ঠিক করে নিতেন। [illegible]
রয়েছে সবই এখন সবাই জানেন। ওঁরা চাইছেন, মাল মশলাগুলো সাজিয়ে [illegible]
আবার নতুন করে গড়ে তুলবেন। মনে ভয়। পৃথিবীর সবসেরা জীবরসায়নবিদ [illegible]
করছেন। বুঝে নিলেন দু'জনই নিজের মতো করে উপায় বের করতে হবে।

কাজ করার প্রথম শর্ত, একটা চমৎকার ডিএনএ কেলাসের ছবি চাই। [illegible]
আসবে মাথায়, একটা অনুমান পাকাপাকি দাঁড় করিয়ে, ডি.এন.এ তৈরি করা [illegible]
অল্প মাল মশলা জুড়ে নিউক্লিওটাইড হয়, একথা রসায়নবিদেরা জানিয়ে [illegible]
তোমাদের জানিয়েছি। নিউক্লিওটাইডগুলো জুড়ে জুড়ে কি চেহারা দাঁড়ায় [illegible]
জানালেন, হেলিক্স হবে। উত্তর শেষ হলো না। ক'টা হেলিক্স পাশাপাশি [illegible]
বেশি? 'বেস'গুলো কি হেলিক্সের ভেতর লুকিয়ে থাকে না বাইরের দিকে [illegible]
দেয়? হেলিক্সতো বলা হলো। কতোটা সে চাপা? কতোটাই বা [illegible]
গঠনের কিছুই হবে না।

লন্ডনের কিংস কলেজেও তখন ডিএনএ-র গঠন নিয়ে গবেষণা চলছে। [illegible]
কলেজের গবেষণা ওয়াটসন ক্রিকের তুলনায় বেশ খানিকটা এগিয়ে আছে। [illegible]
কেন? কিংস কলেজের মরিস উইলকিনস তাঁর খুব ভালো বন্ধু।

কি করা যায় তাহলে? একই কাজের জন্য সরকার দুই গবেষণাগারে টাকা [illegible]
দিয়ে নেমে পড়লেন কাজে। ডিএনএ-র একটা গঠন বের করবেন। এক সপ্তাহ [illegible]
করালেন ওয়াটসন ও ক্রিক। মডেল বানাবার আগে একবার কিংস কলেজে [illegible]
বক্তৃতা শুনতে। বলবেন রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। উইলকিনস-এর ল্যাবে [illegible]
অসামান্য ছবি তুলতে পারতেন। রোজালিনের ধারণা ছিল ডিএনএ তন্তুর [illegible]
চোঙের অক্ষকে কেন্দ্র করে ডিএনএ জড়িয়ে রয়েছে। তবে বলতে পারছিলেন না [illegible]
ডিএনএ চেইন রয়েছে। দুই, তিন, চার, ক'টা হবে বলতে পারেননি। আরও [illegible]
ফসফেট চোঙের বাইরে আর বেসগুলো চোঙের ভেতরে থাকে। ছবি দেখলেই [illegible]
ডিএনএ তন্তু ধাতব বন্ধনীতে জোড়া ছবিতে সোডিয়াম আয়ন দিয়ে জোড়া [illegible]
বক্তৃতায় একটা কথা বলেছেন। সব ফলাফল খুবই প্রাথমিক। কেলাসের [illegible]
করছেন তিনি। যদি পারেন, আরও নিশ্চিত করে ডি.এন.এ-র মডেল বলতে পারবেন।

Rosalind Franklin, 1920-1958 **Maurice Wilkins, 1916-2004**

কিংস কলেজের মরিস উইলকিনস ও রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন

ওয়াটসন সব কথা বুঝতে পারেননি সেদিন। কেলাসবিদ্যা জানতেন না। তাই [illegible]
ভুলে গিয়েছিলেন। ডিএনএ মডেলের গায়ে ক'অণু পানি রয়েছে [illegible]
নিউক্লিওটাইডের আট অণু পানি রয়েছে। ওয়াটসন ভেবেছিলেন, পুরো ডিএনএ [illegible]
বুঝেছিলেন। পরদিনের কথা। ২২ নভেম্বর, ১৯৫১। ওয়াটসন আর ক্রিক [illegible]
এলেন। আসার পথে রোজালিনের কাজের কথা ক্রিককে জানালেন।

চারদিন লাগল, রোজালিনের কথা মাথায় রেখেই ডিএনএ-র নানা মডেল [illegible]
টুকরো ছিল, সেসব জুড়ে ডিএনএ-র মডেল বানিয়েছেন। দুই চেইনের মডেল [illegible]
মডেল বানালেন। চব্বিশ ঘণ্টা পর মডেলটাকে ঘুরিয়ে ঘারিয়ে এমন [illegible]

দু'জনেরই মনে হলো, এমন মডেল হতে পারে। কেন? পরমাণুগুলো আগের চেয়ে অনেক স্বাধীনতা পেয়েছে। এই মডেলে তিনটে চেইন ছিল। সুগার ও ফসফেট ভেতরে। বেসগুলো বাইরে। রোজালিন যা বলেছিলো, মনে করে করেন এই মডেল। উইলকিনস আর রোজালিনকে ওয়াটসন ও ক্রিক এই মডেল দেখালেন। দেখেই রোজালিন ভুল বুঝলেন। জল অণু কম ধরিয়েছেন ওয়াটসন।

ডিএনএ-র হেলিক্স গঠন বিষয়ে রোজালিনের আপত্তি ছিল না কিছু। শুধু বলেছিলেন, বড্ডো বেশি তাড়াহুড়ো হচ্ছে। ঠিকঠাক গঠন বলতে চাইলে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করা দরকার। ওয়াটসন ক্রিক এর উল্টো পথের পথিক ছিলেন। তাঁরা শেষ থেকে শুরু করতে চান। নানারকম মডেল বানাতে বসে গিয়েছেন ওয়াটসন ক্রিক। এরপর দুর্বলতা দেখে নিয়ে একটা একটা করে মডেল নিজেরাই নাকচ করবেন।

প্রথম মডেল ওদের সুপার ফ্লপ। এসব কাণ্ডকারখানা দেখে অধিকর্তা ব্র্যাগ একটু ক্ষেপেই গেলেন। নিজে না বলে অন্যদের দিয়ে বলে পাঠালেন, 'এসব উদ্ভট পাগলামো বন্ধ করতে বলে দাও। রোজালিন আর উইলকিনস কিংস কলেজে অনেক আগে থেকেই এই জিনিস করছেন। ওঁদেরই কাজটা করতে দাও।'

সত্যি বলতে কি, ক্রিকের ডক্টরেট কাজ ছিল আলাদা। এক্স-রশ্মির বিচ্ছুরণ পরীক্ষা থেকে প্রোটিনের গঠন বের করতে হবে। ক্রিকের একাজ পছন্দ নয়। না করলে ডিগ্রি হবে না। তাই করছেন। করছেন আর কোথায়। দুনিয়ার আর সব মানুষের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। নিজের কাজের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। ওয়াটসনও বা কম যান কিসে! রয় মার্কহামের সাথে উদ্ভিদ ভাইরাস নিয়ে কাজ করবেন ওয়াটসন, মাঝে মাঝে জন কেনড্রুকে প্রোটিন কেলাস তৈরিত সহায়তা করবেন, এমনটাই কথা ছিল। কোথায় কি! প্রথম মডেল ফেল করতেই দু'জন নিজেদের কাছে ফিরে এলেন। এলে হবে কি, মন পড়ে আছে ডিএনএ-র জগতে। ঠিক আছে। ল্যাবে না হয় এই কাজ করা যাবে না। বাইরে বেরিয়ে এনিয়ে কাজ করলে দুনিয়ায় কে আটকাবে?

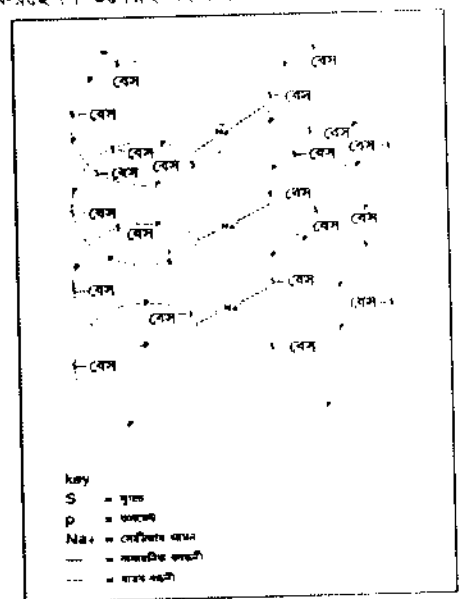

চিত্র : রোজালিনের প্রস্তাবিত মডেল

এদিকে পাউলিংকে নিয়ে সত্যি ওয়াটসন ক্রিক ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। পৃথিবীতে যে চারজন মানুষ দু'বার করে নোবেল পেয়েছেন, তাঁর একজন লাইনাস পাউলিং। তিনি মাত্র একজনই, যিনি এককভাবে দু'বার নোবেল পেয়েছেন। প্রোটিনের হেলিক্স গঠন যাঁর অবদান। তাঁর আর ডিএনএ-র গঠন বলতে কি সময় লাগবে? ভয়টা আরও বেশি ধরিয়ে দিয়েছিলেন পাউলিং পুত্র পিটার। ক্যামব্রিজে জন কেনড্রুর কাছে কাজ করতে এসেছেন পিটার। ওয়াটসন ক্রিকের কাণ্ড দেখে বললেন, 'ওই নিয়ে ভাবছো কেন? বাবা ডিএনএ-র গঠন কাগজে বের করলেন বলে।'

সর্বনাশ। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে পাউলিং পিটারের কাছে গবেষণাপত্রের একটা কপি পাঠালেন। পাউলিং তিন চেইনের ডিএনএ ছবি তৈরি করেছেন। সুগার ও ফসফেট ভেতরে আর বেসগুলো বাইরে রয়েছে। পেপার পড়ে ওয়াটসন ক্রিক উল্লোসিত। কেন? পাউলিং একগুচ্ছ ভুল করেছেন। পাউলিং যত ভুল করেন, ওয়াটসন ক্রিকের ততো ভালো হয়। ভয় তবু দূর হয় না। আবোল তাবোল কোথাও পাউলিং কাজ করছেন না। ক্যালটেকে রয়েছেন। যে কেউ পাউলিং-এর ছবি সংশোধন করে দিয়ে ডিএনএ-র সঠিক গঠন বলে দিতে পারেন। দেরি কিছুতেই করা চলবে না।

কতগুলো জিনিস ঠিকঠাক জেনে নিতে হবে। সুগার ও ফসফেট ডিএনএ অণুর ভেতরদিকে থাকে না বাইরের দিকে থাকে। ক'টা হেলিক্স দিয়ে ডিএনএ তৈরি? নাইট্রোজেনের বেসগুলো কেমন করে ডিএনএ-র তন্তুতে সাজানো থাকে?

একটা ছবি দেখুন। তাকের উপর কাপ প্লেট যেমন করে পরপর সাজানো থাকে, বেসগুলো তেমন থাকতে পারে। ওয়াটসন ক্রিক দেখেছেন। এরকম পরপর এরা থাকে না। 'না' বলা হলো। থাকবে কি করে তবে, বলতে হবে। ১৯৫২ সাল। কেমব্রিজে তখন কাজ করছেন জন গ্রিফিথ। অঙ্কের মানুষ ওয়াটসন তাঁর কাছে গেলেন। বললেন, বলে দাওতো, চারটে 'বেস' ডিএনএ অণুতে কতরকমভাবে সাজানো থাকতে পারে। গ্রিফিথ দেখালেন, অ্যাডেনিন থাইমিনের সাথে থাকবে। সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে থাকবে। দিন কয় পর একদিন জন কেনড্রু খবর পাঠিয়ে ওয়াটসন আর ক্রিককে দেখা করতে বলেন। গিয়ে তাঁরা দেখতে পান, এক অপরিচিত মুখ কেনড্রুর কাছে বসে রয়েছেন। পরিচয় হলো। আরউইন শার্গভ। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন। একসাথে লাঞ্চ করতে গেলেন চারজন। বসে অনেকক্ষণ কথা হলো। শার্গভের কাজের সাথে ওঁদের একটু আধটু পরিচয় ছিল। এবার মুখোমুখি কথা হলো। শার্গভ বললেন, নানারকমের ডিএনএ নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। দেখেছেন সব ডিএনএ-র বেলাতেই একটা কথা সত্যি হয়। অ্যাডেনিন আর থাইমিন ১ ঃ ১ পরিমাণ থাকে। এই কাজ শার্গভ বছর তিন আগে ছাপিয়েছেন। ক্রিক বললেন, খুব বড়ো কাজ, জানতাম না আগে। শার্গভ যা বোঝার বুঝে নিয়েছেন ততোক্ষণে। এঁরা এই লাইনে বোধহয় একেবারেই নতুন। এখনও ওঁদের বহুদূর যেতে হবে। এতো কম জেনে বড়ো কাজ করে উঠবেন কি করে? শার্গভের ঔৎসুক্য থামে না। ওয়াটসন আর ক্রিক একটা বিষয়ে এখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন। গ্রিফিথ অঙ্কের ভাষায় যা বলেছেন, শার্গভ হাতে কলমে পরীক্ষা করে একই জিনিস বলেছেন। চোখ বুঁজে অ্যাডেনিনের সাথে থাইমিন আর সাইটোসিসের সাথে গুয়ানিনকে জুড়ে দেয়া যায়। মাইটোসিস কেমন করে হয়, চারটে ধাপ কি করে পর পর পার হয়, বিজ্ঞান ততোদিনে বের করে ফেলেছে। যদিও কোষ আর ক্রোমোজোম ভাগাভাগির কাহিনিতে, ওয়াটসন ক্রিক মনে করতেন, আসল কাজ করে ডি.এন.এ। একটা ডি.এন.এ নিয়ে যদি দুটো ডিএনএ তৈরি করা না যায় তবে যা মডেল তৈরি করবেন ওঁরা, কোন মানেই দাঁড়াবে না।

ধরা যাক একটা ডিএনএ অণুর খানিকটা অংশ নিচে দেখানো হচ্ছে–

A–T–C–G–G–A–T–T

গ্রিফিথ আর শার্গভের কথামত তার সাথে ডিএনএ-র যে টুকরো জুড়বে, সে হবে নিচের মত

T–A–G–C–C–T–A–A

জুড়লে চেহারাটা দাঁড়ায় কেমন? দেখা যাক।

A–T–C–G–G–A–T–T

T–A–G–C–C–T–A–A

এখন কোষ বিভাজন হলে নিউক্লিয়াস দু'ভাগ হয়। ক্রোমোজোম দু'ভাগ হয়। ফলে ডিএনএ ও হয়তো দু'ভাগ হয়। একটা কোষে একটা তন্তু যায়, গিয়ে বাকি অর্ধেক জুড়ে। অন্য কোষে বাকি তন্তু যায়। গিয়ে অন্য অর্ধেক জুড়ে। ফলে কি হয়? দুটো কোষে ঠিক আগের মতো দুটো ডিএনএ তৈরি হয়ে যায়। ওয়াটসন আর ক্রিক খুবই আনন্দ অনুভব করেছেন সেদিন। বুঝি লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি ওঁরা চলে এসেছেন।

এবার ওঁরা ডিএনএ কেলাসের একটা পরিস্কার ও ভালো এক্স-রে ছবি চাইছেন। কে দেবে? মরিস উইলকিনস-এর ল্যাব থেকে রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন দিতে পারেন।

উইলকিনস শুরুতে ডিএনএ-র গঠন নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেও শেষে আর এদিকে যেতে চাইলেন না। ডিএনএ কেলাসের ভালো ছবি না পেলে কি দিয়ে কি করবেন? একজন তেমন কাউকে চাই। তিনিই রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন। লন্ডনের সেন্ট পল'স গার্ল স্কুল ও পরে কেমব্রিজে পড়াশোনা করেন রোজালিন। রোজালিন এই ল্যাবে যোগ দেবার আগে প্যারিসের এক গবেষণাগারে ছিলেন। কয়লার কেলাস নিয়ে পরীক্ষা করতেন। একটা কথা তোমাদের বলতে ভালো লাগছে না; তবু বলি। রোজালিন যে চমৎকার ডিএনএ কেলাসের ছবি তুলে দিয়েছিলেন, তা না পেলে ওয়াটসন ক্রিকের কাজ হতো না। তবু ওয়াটসন আর ক্রিকের নানা লেখায় তিনি উপেক্ষিতা থেকেছেন। শুধু উপেক্ষিত নয়, তাঁর অক্ষমতার নানা কথা লিখেছেন ওঁরা। নোবেলজয়ী আন্দ্রে লফ ওয়াটসনের এমন কথা বার্তাকে 'নিষ্ঠুরতা' বলেই আখ্যায়িত করেছেন। বিরক্ত বোধ করেছেন শার্গভও।

রোজালিনের সমালোচনা ওয়াটসনের নির্দয় মনেরই পরিচয় রেখেছে। শার্গড বলতেন না নইলে, '... সে খুবই ভালো বিজ্ঞানী ছিল। ডি.এন.এ. গঠন উদ্ভাবনায় তাঁর অবদানও কম নয়'। রোজালিনের এক বান্ধবী ছিলেন অ্যানে সায়ের। বই লিখেছেন 'রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন অ্যান্ড ডিএনএ। ওয়াটসনকে কটাক্ষ করেছেন ওই রচনায়। বলতে ছাড়েননি, 'ডাবল হেলিক্স' এক কল্পবিজ্ঞান বলে মনে হয়। রোজালিন ফ্র্যাঙ্কলিন সেখানে কোথাও আছে বলে মনে হয় না।' উইলকিনসও কিন্তু রোজালিনকে পছন্দ করতেন না।

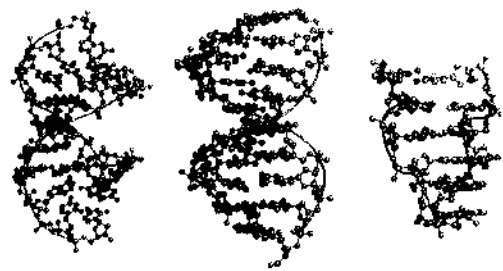

ঠিক-ঠাক কাজও করতে দিতেন না। অথচ আমাদের মনে না রেখে উপায় নেই, ডিএনএ-র দু'রকমের নমুনার (ডিএনএ-A ও ডিএনএ-B) হদিশ রোজালিনই আমাদের প্রথম দিয়েছেন। B-DNA এর কথা উইলকিনস বেশ পরে ওয়াটসনকে জানিয়েছিলেন। আর কি করেছেন? রোজালিনের তোলা ডিএনএ ফটোগ্রাফ লুকিয়ে লুকিয়ে কপি করেছেন। রোজালিনের আর এই ল্যাবে কোন আগ্রহ নেই। তিনি জে.ডি. বার্নালের ল্যাবে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। সেই জে.ডি. বার্নাল যার 'সায়েন্স ইনি হিস্ট্রি' আজও পৃথিবীর নানাদেশে নিবিড় সাগ্রহে গঠিত হয়।

'একান্ন নম্বর' ছবিটি উইলকিনস-এর কাছ থেকে ওয়াটসন পেলেন। ১৯৫২ সালের মে মাসে রোজালিন এই ছবি তুলেছিলেন। সব থেকে ভালো ছবি ছিল। রোজালিন রেখে দিয়েছিলেন, এই নিয়ে পরে কাজ করবেন ভেবেছিলেন। ছবিটি দেখলেই বোঝা যায়, ডিএনএ-র হেলিক্স গঠন রয়েছে। যা দেখেছেন, এঁকে ফেললেন কাগজে। পরদিন ব্র্যাগ, কেনড্রু ও ক্রিককে ডেকে এনে ছবি দেখালেন। উৎসাহের সারল্য দেখে ব্র্যাগ আর ওঁদের ডিএনএ নিয়ে কাজ করতে বাধা দিলেন না।

ওয়াটসন নানা জায়গার খবর সব এক জায়গায় জমা করেছিলেন। প্রথম খবরতো এই মাত্র বলা হলো। ডিএনএ দেখতে হেলিক্স-এর মতো। এছাড়া উইলিয়াম অ্যাসটবুরি বলেছেন আগে, দুটো পরপর বেসের দূরত্ব ৩.৪ A। কিংস কলেজ থেকে উইলকিনস জানালেন, ডিএনএ অণুর ব্যাস কুড়ি অ্যাংস্ট্রমের মতো।

পাঁচ সপ্তাহ কাজ হলো। দিন নেই, রাত নেই, কাজ হলো। ওয়াটসন দুই চেইনওয়ালা ডিএনএ বানালেন। সুগার-ফসফেট ভেতরে রইল। ক্রিক নিজের থিসিস নিয়ে তাড়ায় রয়েছেন। মাঝে মাঝে চোখ তুলে ওয়াটসনকে মতামত দিচ্ছেন। একবার বললেন শুধু, বেসগুলোকে হেলিক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েই দেখুন না। হলো তাই। দুই চেইনের হেলিক্স মডেল হলো। বেসগুলো ভেতরে রইল। ফসফেট-সুগার বাইরে রইল।

৭ই মার্চ, শনিবার ১৯৫৩। ডিএনএ-র গঠন সমাধা হয়েছে। নতুন এই দেবতা দর্শনে তীর্থযাত্রীরা একের পর এক আসছেন। কারা তাঁরা? ব্র্যাগ, পেরুজ, কেনড্রু, ডোনাহো, উইলকিনস, রোজালিন ও আরও অনেকে। সবাই মেনে নিলেন এমন মডেল। একটা ছোট্ট পেপার লিখলেন দু'জনায়। ১৯৫৩ সালের ২৫ এপ্রিল 'নেচার' পত্রিকায় 'ছোট্ট খবর' হিসেবে ছাপা হলো। অনেক ভুল ত্রুটি ছিল দু'জনার। তবু বিজ্ঞানের এই অসামান্য জয়যাত্রাকে ১৯৫৩ সালে চিহ্নিত করেছিলেন ওয়াটসন ক্রিক। এই জয়যাত্রা আজ জেনেটিক গবেষণার বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেছে। নীতি আর মূল্যবোধ মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে মূল্যহীনতার আবহে। ১৯৬২ সালে ওয়াটসন, ক্রিক আর উইলকিনস এই কাজের জন্য নোবেল পান। এই কাজ বিশ শতকের সেরা আবিষ্কার বলে বি.বি.সি. ঘোষণা করে।

★ *প্রবন্ধকার* : জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক ও গ্রন্থাকার, সাধারণ সম্পাদক : প্রান্তিক বিজ্ঞানাগার, খুলনা; সহকারী ম্যানেজার, এম.আই.এস.; প্রতীক ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড লি.

মৌমাছি পালন : অর্থনৈতিক সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

মোঃ নজরুল ইসলাম

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা, মনোরম প্রাকৃতিক বৈচিত্র আর অগাধ সম্ভাবনার দেশ হলো আমাদের এই বাংলাদেশ। যদিও বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বলে আমরা পরিচিত। তলাবিহীন ঝুড়ি বলে রয়েছে বিশাল অখ্যাতি। তথাপি জোর গলায় বলতে চাই- এটা কিছু সংখ্যক মানুষের দুর্নীতি আর চরম অপকর্মের ফল। এদেশের মাটি মানুষ আর প্রকৃতির দোষ নয়। স্রষ্টার দেয়া বিশাল সম্পদকে আমরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়ে কলঙ্ক কালিমা লেপেছি ললাটে। বাংলাদেশে মৌমাছি পালন বিশাল সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার আমাদের সামনে উন্মোচন করে দিতে পারে। এর মাধ্যমে সম্ভব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন গ্রামের সাধারণ মানুষ যাদের ৯০ ভাগই কৃষির সাথে জড়িত। তারা তাদের অন্য কাজের পাশাপাশি এটাকে শখ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, আর গ্রামীণ পরিবেশে যারা ছাত্র ও শিক্ষক হিসেবে জীবন যাপন করছেন তারাও তাদের অবসরকে চমৎকার একটি আয়বর্ধক কাজে লাগাতে পারেন। গ্রামীণ পর্যায়ে শুধু নয় বরং মফস্বল শহরগুলোর প্রায় সবগুলোতেই রয়েছে মৌ-চাষের অগাধ সম্ভাবনা। কেবল প্রয়োজন সরকার ও জনগণের কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ। বাংলাদেশে মৌমাছি পালনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি আলোচনা তুলে ধরা হলো :

জাত পরিচয়

বাংলাদেশ ৪ ধরনের মৌমাছিরই উত্তম আবাসস্থল। জাতগুলো হলো- (ক) এপিস ডরসাটা, (খ) এপিস সেরানা, (গ) এপিস ফ্লোরিয়া, (ঘ) এপিস মেলিফেরা।

ক) এপিস ডরসাটা : এরা আকারে বেশ বড়। এরা গাছের ডালে, বিল্ডিং এর কার্নিসে লম্বাকারে একটিমাত্র চাক বেঁধে বসবাস করে। তবে যাযাবর প্রকৃতির বলে পালন অনুপযোগী। তবে আমাদের দেশে সুন্দরবন এলাকায় এদের প্রচুর বসবাস এবং বহু মাওয়ালী পরিবারের আয়ের উৎস। উন্নত প্রযুক্তিতে এদের মধু আহরণ করা প্রয়োজন। তাহলে মৌচাকের আওতায় না এনেও এদের চাক থেকে নিয়মিত মধু আহরণ করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যক্তিগত ও জাতীয় আয় বর্ধন করা সম্ভব।

খ) এপিস সেরানা : দেশীয় ভাষায় যাকে মাটিয়া মৌমাছি বা ক্ষুদিনা মৌমাছি বলা হয়। এক সময় প্রকৃতিতে এদের প্রচুর বিচরণ ছিল। এরা মাটির গর্তে, গাছের ফোকরে, ঘরের চালায়, পরিত্যক্ত টিন বা কাঠের বাক্স ও মাটির কলসীতে একাধিক চাক করে বসবাস করে। পরিকল্পিত উপায়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতিটি কলোনী থেকে বৎসরে গড়ে কমপক্ষে ২৫ কেজি মধু আহরণ সম্ভব।

গ) এপিস ফ্লোরিয়া : এরা আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ঝোপ-ঝাড়ে অথবা বাড়ির জানালায়, দরজায় একটিমাত্র ছোট চাক বেঁধে বসবাস করে। আকারে খুব ছোট ও মধু আহরণের পরিমাণও খুব কম হবার কারণে মধু সংগ্রহ লাভজনক নয় এবং চাষ অনুপযোগী।

ঘ) এপিস মেলিফেরা : এটি ইউরোপীয়ান ব্রীড বলেই সর্বাধিক পরিচিত। অতি সম্প্রতি একটি বেসরকারি এনজিও তা বাইরের দেশ থেকে সংগ্রহ করে। অতঃপর বিসিক তাদের ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে জাতটি সংগ্রহ করে এবং আগ্রহী চাষকারীদের মধ্যে কলোনী বিক্রয় শুরু করে। আকৃতি ও স্বভাব থেকে বুঝা যায় যে, এগুলো ইটালিয়ান ব্রীড। ১০টি করে ফ্রেম দিয়ে কমপক্ষে দুটো চেম্বারে এদের লালন-পালন করা হয়। পর্যাপ্ত সোর্স দিতে পারলে বছরে কলোনী প্রতি কমপক্ষে ১০০ কেজি মধু উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে মৌ-পালকদের নিকট এটি খুবই উপযোগী জাত হিসাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। এর নমনীয় স্বভাব, মধু আহরণ ক্ষমতা, প্রবণতা এবং মধুর গুণগত মান মৌ-পালকদের নিকট এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। ব্যবসায়ীক ভিত্তিক পালনের জন্য এটি সর্বোত্তম জাত।

মৌমাছি পালনের গুরুত্ব

মৌমাছি পালন অত্যন্ত লাভজনক পেশা। এতে পুঁজি লাগে কম। যার জন্য বলা হয়, "পুঁজি কম, ব্যয় অল্প এর নাম মধু শিল্প"। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বেকার যুবক, ভূমিহীন, শ্রমিক, দুঃস্থ, বঞ্চিত দরিদ্র মহিলা, ভূমিহীন প্রান্তিক চাষী মৌমাছি পালনের মাধ্যমে সংসারে বাড়তি আয়ের যোগান দিতে পারেন। বাড়ির বারান্দায়, উঠোনের কোণায়, বাগানের গাছের ছায়াটাকে কাজে লাগিয়ে অতি সহজেই বেকার যুবক ও মহিলারা মৌমাছির খামার গড়ে তুলে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও ব্যবসাটির মাধ্যমে দেশের পুষ্টিহীন দরিদ্র জনসাধারনের বিরাট চাহিদা পূরণ হতে পারে। সূরা নাহলে আল্লাহপাক মধুকে মানবজাতির জন্য শেফা বলে ঘোষণা করেছেন। প্রতি সকালে এক চামচ মধু আর এক চিমটে কালজিরা আপনাকে ও আপনার পরিবার পরিজনকে আমৃত্যু শারীরিক নিরাপত্তা দিতে পারে। তাছাড়া স্বাদে ও গুণগতমানে আমাদের দেশের মধু অত্যন্ত উন্নত মানের। এছাড়া একক ফসল চাষের ফলে আহরিত মধুকে আমরা সিজন অনুযায়ী সুর্নিদিষ্ট নামে আখ্যায়িত করতে পারি। যা অনেক উন্নত দেশেও সম্ভব নয়। যেমন কুল, সরিষা, সূর্যমুখী, মূলা, লিচু বা তিলের মধু। একেক সময় একেক ফুলের মধু স্বাদে ও রং-এ আলাদা হওয়ায় বাইরের বাজারে আমরা বিভিন্ন নামে রপ্তানীর সুযোগ নিতে পারি। বর্হিবিশ্বে বিশেষত: মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের মধুর যথেষ্ট চাহিদা আছে। তাই পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বেকারত্ব দূর করতে এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ড হিসেবে, সর্বোপরি বৈদেশিক মূদ্রা অর্জনে মৌমাছি পালনের গুরুত্ব অপরিসীম এবং বাংলাদেশে মৌচাষ একটি বিরাট সম্ভাবনার দ্বার। তবে এ বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিও একেবারে সমস্যামুক্ত নয়। অন্য আরোও দশটি সেক্টরের মত এক্ষেত্রেও রয়েছে বেশ কিছু সমস্যা।

মৌ-চাষের সমস্যাসমূহ

নিম্নে মৌমাছি পালনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর দিকে আলোকপাত করা হলো :

১) মৌমাছি পালন সম্পর্কে যথাযথ কারিগরী জ্ঞানের অভাব : আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশে মৌমাছি পালন একটি লাভজনক পেশা বা পার্শ্ব পেশা। তবে যেহেতু এটা গ্রামীণ ভিত্তিক আর গ্রামের অধিকাংশ মানুষই অল্প শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত বেকার ও দারিদ্র তাই মৌমাছি পালন বিষয়টি এখনও তাদের কাছে অপরিচিত। এ জন্য আমাদের যা প্রয়োজন তা হলো প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান। এত কাছের, এত চেনা-জানা ও উপকারী প্রাণীটি শুধু সামান্য কারিগরী জ্ঞান লাভের মাধ্যমে আমাদের পরম সাহায্যকারী বন্ধু হয়ে উঠতে পারে। যথাযথ জ্ঞানের অভাব আমাদের মিটাতে হবে।

এ তত্ত্বীয় বিষয়ে যাদের দখল আছে তাদের আর যারা ব্যবহারিক প্রয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। আগ্রহী সকল ব্যক্তিকে কারিগরী জ্ঞান লাভের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে একশত ভাগ। মৌমাছি পালনের আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্বে এনে জাতীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৌমাছি পালন কার্যক্রমের ইতিহাস কয়েকশ বছরের। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির এ যুগে আমাদের সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাবার। কারণ আমাদের দেশটি কৃষি প্রধান এবং মৌমাছি পালন একটি কৃষি নির্ভর প্রকল্প।

২) মৌমাছি সম্পর্কে অহেতুক ভীতি : কিছু লোক আছে যারা মৌমাছিকে অত্যন্ত ভীতির চোখে দেখে, ফলে এ থেকে অনেক দূরে থাকে। আর কিছু লোক যারা মধুর লোভও সামলাতে পারে না, আবার ভীতিও রয়েছে তাদের দ্বারা মৌমাছি হয় নিগৃহীত। সামান্য মধুর লোভে একটি অত্যন্ত উপকারী বন্ধু পোকাকে আগুনে আত্মহুতি দিতে হচ্ছে। নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। অথচ মৌমাছি কখনও ধৈর্যের শেষ সীমায় না পৌঁছালে কাউকে হুল ফুটায় না। কারণ সে ভাল করেই জানে এরা তার আত্মঘাতি (সুইসাইডিং এ্যাটাক) হামলা। হুল ফুটানোর কিছুক্ষণের মধ্যে মৌমাছিটি মারা যায়। অতএব মৌমাছিকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে যে সমস্ত কারণে তারা আক্রমণে উদ্যত হয়, সেগুলো থেকে সাবধান হতে হবে অবশ্যই। তাছাড়া হুলের উপাদান মেলিটিন, হিষ্টামিন ইত্যাদি সহনীয় মাত্রায় স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তাছাড়া বর্তমানে সারা বিশ্বে এপিথেরাপি (মৌমাছির হুল ফুটানোর মাধ্যমে চিকিৎসা পদ্ধতি) প্রতিষ্ঠিত একটি বিষয়। যদি কোন ব্যক্তি বী-ভেনমে বিশেষ এলার্জি সম্পন্ন হয় তাহলে ভিন্ন কথা। সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, এক পাউন্ড বডি ওয়েটের জন্য ১০টি মৌমাছির হুল ফুটালেও কোন ঝুঁকি নেই। অর্থাৎ এই হিসেবে ১৬০

পাউন্ড ওজনের প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষকে যদি ১৫০০ মৌমাছিও হুল ফুটায় তাতেও তার মৃত্যু হবে না। সুতরাং অহেতুক ভীতির কোন কারণ নেই। বরং আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ্য করছি যারা মৌমাছি নিয়ে কাজ করেন আর কারণে অকারণে সীমিত আকারে হুল বিদ্ধ হন তাদের বিভিন্ন প্রকার বাতের ব্যাথা, নানা প্রকার চুলকানী এবং পুরনো মচকানো ব্যাথা যা আমাবশ্যা-পূর্ণিমায় ফিরে ফিরে আসতো তার স্থায়ী উপশম হয়েছে।

৩) জাত নির্বাচন : একই সময়, শ্রম এবং প্রায় একই অর্থ ব্যয়ে অধিক মধু পেতে হলে উন্নত জাত নির্বাচন বিশেষ জরুরী। বিসিক যদিও দীর্ঘদিন যাবৎ মৌমাছি চাষ নিয়ে এদেশে কাজ করে যাচ্ছে তথাপি মধুর উপযুক্ত একটি জাত নির্বাচন এর অভাবে আমরা বহু পিছিয়ে গেছি। সেরানা মৌমাছি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মধু উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। বিগত সময়টুকু আমরা সেরানার পাশাপাশি মেলিফেরা (হাইব্রীড) মৌমাছি নিয়ে কাজ করে বহু দূর এগিয়ে যেতে পারতাম এবং এতোদিনে বিশ্ববাজারে মধু বিক্রয়ের একটি অবস্থান অবশ্যই গড়ে উঠতো। অনেক দেরিতে হলেও বিসিক ১৯৯৯ সাল থেকে মেলিফেরা মৌমাছি এদেশে পরিচিত করাতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সারা দেশে বিশেষত: উত্তরাঞ্চলের পাবনা, রাজশাহী ও দিনাজপুর জেলায় বেশ কিছু বেসরকারি উদ্যোক্তা গড়ে উঠেছেন এবং ভাল অবস্থানে আছেন। যারা মাত্র ৩ বছরের ব্যবধানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মধু উৎপাদন শুরু করেছেন এবং মেলিফেরা মৌমাছি থেকে তাদের আহরিত মধুর পরিমাণ এ পর্যন্ত অন্তত ১০ হাজার কেজি।

৪) প্যাকেজিং ও বাজারজাতকরণ সমস্যা : দেশে যে পরিমাণ মধু উৎপাদিত হচ্ছে (সুন্দরবনসহ) আর যে পরিমাণ চাহিদা তাতে সারা দেশে একটি যথাযথ বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা যদি ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া যায় তাহলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে মধু আমদানীর প্রয়োজন হবে না। কারণ স্বাদে ও গুণগত মানে আমাদের মধু খুবই উন্নত। কিন্তু সঠিক প্রসেসিং পদ্ধতি এবং সুন্দর প্যাকেজিং এর অভাবে আমাদের মৌ-চাষী এবং মাওয়ালীরা যথাযথ বাজার পাচ্ছে না। অথচ আন্তর্জাতিক হানী মার্কেটে বিশেষত: মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে মধুর যে বিশাল চাহিদা তা আমরা সহজেই দখল করতে পারতাম। উৎপাদকরাও একটা উৎসাহমূলক বাজার মূল্য পেতেন। সাম্প্রতিককালে একটি ঔষধ কোম্পানি মধ্যপ্রাচ্যে মধু এক্সপোর্টের অর্ডার পেয়েছেন বলে জানা যায়।

কিন্তু তাতে একচেটিয়া মুনাফা প্রবণতা উৎপাদককে নিরুৎসাহিত করছে। ফলে একদিকে আন্তর্জাতিক বাজার হাতছাড়া হচ্ছে। অন্য দিকে উদ্যোক্তারা পিছিয়ে যাচ্ছেন। উভয় দিক থেকে ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হচ্ছি আমরা। অথচ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিককে কাজে লাগিয়ে যদি একটি কেন্দ্রিয় প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয় তাহলে উৎপাদনকারী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো বঞ্চনা থেকে রেহাই পেয়ে দেশীয় একটি সম্পদ আহরণে তৎপর হতেন। বিসিক যদি শুধু প্রশিক্ষণ, প্রসেসিং আর বাজার ব্যবস্থাপনার নিয়মিত আয়োজন করেন তাহলে উৎপাদকরা পণ্য নিয়ে সমস্যায় তো পড়বেনই না, বরং উৎসাহিত হবেন। সারা দেশব্যাপী বিসিকের শাখাগুলো খাঁটি মধু বিক্রয়কেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে। কেজি প্রতি সার্ভিস চার্জ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থাটি বিরাট আয় করতে পারেন। আর মৌ-পালকগণও উৎসাহিত হবেন। বিসিক নির্ধারিত মধুর মূল্য ২৫০/-। যদি উৎপাদকদের নিকট থেকে তারা ২০০/- কেজি ক্রয় করেন আর প্রসেসিং, প্যাকিং এবং মার্কেটিং পর্যন্ত যদি ৩৫-৪০/- পড়ে তাহলে প্রতি কেজিতে ১০-১৫/- হিসেবে নীট লাভ পাবেন। কয়েক হাজার টন মধু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অংকটি অবশ্যই লোভনীয় পরিমাণ। অবশ্য কৃষি বিপনন অধিদপ্তরও এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

৫) রোগ-ব্যাধি জনিত সমস্যা : বিগত ১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এক প্রকার রোগ সাধারণভাবে যাকে মৌ-পালকগণ ভাইরাসজনিত অসুখ বলে থাকে তা ব্যাপকভাবে দেখা যায় বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও রাজশাহী এলাকায়। মৌ-চাকের ভিতরেই মুককীট অবস্থায় বাচ্চা নষ্ট হয়ে যায়। মৌ-মাছির বংশ বিস্তার প্রচন্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে শুধু তাই নয় বরং প্রকৃতি থেকে এ জাতটি প্রায় নিঃশেষ হতে বসেছিল। কিন্তু ইদানিং প্রকৃতিগতভাবেই এর সমাধানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ব বিভাগ মৌ-পালকদের উত্তম বান্ধব হিসাবে জুড়ে দিতে পারে এবং পারে স্বত:স্ফুর্ত সহায়তা প্রদান। মৌ-পালনকারীদের যেমন উপকৃত করবে তেমনি সম্মানিত অধ্যাপক, গবেষকগণের জ্ঞানকে ও করবে সমৃদ্ধ। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা যেন হতাশাগ্রস্ত না হন। এই জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

৬) **উৎসফুল (সোর্স) সম্পর্কে যথার্থ তথ্যের অভাব :** সবুজে শ্যামলে আর ফুলে-ফলে ভরা এই দেশটি মৌ-মাছি পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। দেখা গেছে যে, সারা বছরব্যাপী এদেশের কোনো না কোনো এলাকায় কোন না কোন ফুল অর্থাৎ সোর্স অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তার যথার্থ তথ্য আমাদের মৌ-পালকদের কাছে নেই বা পৌছায় না। ফলে মৌ-পালনে মধু উৎপাদনকাল খুব সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অথচ সারা দেশের ফসলের তথ্য চিত্র যদি মৌ-পালকদের সামনে থাকে তাহলে ন্যূনতম ১০টি বক্স নিয়ে যারা ক্ষুদ্র এপিয়ারী হিসাবে মৌ-পালন করছেন তারা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৌ-পালনে অধিক আগ্রহী হয়ে উঠতেন এবং মধু সংগ্রহের অনুপাত বেড়ে যেত অনেকগুণ। ফলে এপিয়ারী বা মৌ-খামার ব্যবস্থাপনা খরচ অনেক কমে যেত।

এ বিষয়ে উপজেলা বা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসগুলো যথাযথ তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারেন। জেলা অথবা উপজেলা কৃষি অফিসগুলো তাদের ব্লক সুপার ভাইজারদের মাধ্যমে চাষকৃত ফসলের পরিসংখ্যান যদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন যে, এ জেলার কোন উপজেলায় চলতি মৌসুমে কত বিঘা সরিষা, কতটা সূর্যমুখী, কতটা সয়াবিন, তিল, গুজি তিল, ধনিয়া, মৌরি, চন্দনি, ঢেমসির চাষ করা হয়েছে এবং ফুল ফোটার সম্ভাব্য সময়টি কখন তাহলে মৌ-পালন তথা আমাদের দেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে। সংগৃহীত তথ্যটুকুর বদলায় সারা দেশব্যাপী মধু উৎপাদন বেড়ে যেতে পারে কয়েক শত এমনকি কয়েক হাজার টন। এ তথ্যের ফলে মধু উৎপাদন বাদ দিয়েও মৌমাছির মাধ্যমে সঠিক পরাগায়নের ফলে ফসল বা ফলজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে প্রায় দ্বিগুণ।

৭) **পরিকল্পিত আবাদের অভাব :** পরিকল্পিতভাবে ফসল, সবজি ও ফসলের আবাদ মৌ-পালনকে উৎসাহিত করবে। অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসলের উৎপাদন বেশি সে এলাকায় এককভাবে সে ফসলের যদি চাষ করা হয় তাহলে খামার স্থাপনের সুবিধা হবে। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে আবাদের ফলে মধু ফুলের ওভার লেপিং হবে না। যেসব সরিষা ফুল শেষ না হতেই পরিকল্পিত আবাদের ফলে ঢেমসি বা মূলা ফুল বা সয়াবিন ও গাজি তিল উৎস হিসাবে পাওয়া যেতে পারে। আবার ঢেমসি শেষ হতে না হতে চন্দনী বা ধনিয়া বা মৌরি, সূর্যমুখী ফুল ফুটে। এটার পর আসে লিচু অত:পর তিল। তিলের পর ধৈঞ্চা, শাপলা বা নিচু এলাকার বর্ষাকালীন নানা জাতীয় ফুল। তবে পরিকল্পিত আবাদের ক্ষেত্রে চাষীরা নিজেরা যদি মৌ-পালক হন তবেই সুপরিকল্পিত আবাদ সহজ এবং সম্ভব। এ ক্ষেত্রে মৌ চাষে সাধারণ জনগোষ্ঠী তথা কৃষক সম্প্রদায়কে অধিক মাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮) **বন বিভাগের তথ্য পরিবেশন :** বন বিভাগ একইভাবে কৃষি বিভাগের মত সহযোগিতা দিতে পারেন। তারা জানতে পারেন কোন কোন গাছের ফুল ঠিক কখন ফুটে এবং তাদের কোন বাগানে গাছের সংখ্যা কত। অর্থাৎ সে বনের আকারটি কত বিশাল এ হিসাব পেলে সেখানে কতটি মৌ-বক্স রাখা যেতে পারে তা জানা যাবে। বর্ষব্যাপী ফ্লাওয়ারিং চার্ট অনুযায়ী সারাদেশব্যাপী Migratory Bee Keeping সম্ভব শুধু নয় বরং অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। তবে এ সুনির্দিষ্ট দায়িত্বটুকু বন বিভাগকে পালন করতে হবে। সুন্দরবনের কোন রেঞ্জে কখন কোন ফুল ফুটে, তাছাড়া সিলেট ও চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকাগুলোর যথাযথ তথ্য ও বন বিভাগ পরিবেশন করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেঞ্জ তাদের এরিয়ার বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করলে মৌ-পালকগণ তথা জাতি এর থেকে উপকৃত হতে পারে। সমতল ভূমিতে বর্ষাকালীন সময়ে তেমন একটা সোর্স পাওয়া যায় না সে সময় বন বিভাগ মৌ-পালকদের জন্য তাদের সংরক্ষিত এলাকাকে ব্যবহারের বৈধ অনুমতি দিতে পারেন।

৯) **পুঁজি বা খামার গঠনে সরকারি সহযোগিতার অভাব :** যুব উন্নয়ন বিভিন্ন প্রকল্পের উপর লোন দিয়ে থাকে। কিন্তু মৌ-মাছি পালনের উপর ঋণ প্রদানে কর্মকর্তারা আগ্রহী নন। অথচ গ্রহণ যোগ্যতার দিক থেকে মৌ-মাছি পালন আমাদের দেশে অনেক অনেক সম্ভাবনাময়। খামার স্থাপনে বিসিকের আত্মসংস্থান কর্মসূচি, যুব উন্নয়ন এবং বিভিন্ন ব্যাংকগুলো যাতে উপযুক্ত পরিমাণ ঋণ প্রদান করে সে দিকে সরকারি নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন। সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস পেলে বহু দক্ষ উদ্যোক্তা এগিয়ে আসবে এবং মৌ-মাছির খামার ও মধু প্রক্রিয়াজাতকরণ তথা প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপন করে লাভজনক শিল্প গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

কিছুটা হলেও বেকারত্ব দূরীকরণে এ শিল্প অবদান রাখতে পারবে। তাছাড়া গ্রামীণ পর্যায়ে মহিলারা ন্যূনতম ২টি কলোনী ক্রয় এবং ৬মাসের জন্য ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের অর্থ পেলে তারাও খুবই আগ্রাহী হবে। এ ক্ষেত্রে দেশীয় মৌ-মাছির (এপিস সেরানা)- ২টি কলোনী ৬ মাসের ব্যয়সহ ঋণ প্রয়োজন ৩০০০/- আর হাইব্রিড (এপিস মেলিফেরা) প্রজাতির ২টি কলোনীর জন প্রয়োজন ৭-৭.৫ হাজার টাকা।

১০) মৌ-পালন সংক্রান্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা এবং গবেষণার অভাব : মৌ-মাছি পালন সংক্রান্ত বই-পুস্তকের অভাব আমাদের রয়েছে। এ পর্যন্ত বাংলায় ২/১টি বই পাওয়া যায় তাও পূর্ণাঙ্গ নয়। কেবল সাধারণ আলোচনা। মৌমাছি পালনকে শিল্পরুপ দিতে হলে এ অভাব মিটাতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি, কৃষি বিভাগ ও ইসলামি ফাউন্ডেশনের প্রকাশনা বিভাগ উপযুক্ত ভূমিকা নিতে পারে। সাধারণের বোধগম্য করে বিদেশী বই-পুস্তক-এর অনুবাদ বাজারে ছাড়তে হবে। তাছাড়া কৃষি বিষয়ক পত্র-পত্রিকাগুলোতে মৌ-মাছির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য একটি নিয়মিত কলাম আসা প্রয়োজন এবং এতে সংযুক্ত হতে পারে কৃষিসহ সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর কীটতত্ত্ব বিভাগের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের গবেষণার ফল। সফল মৌ-পালকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা। তাহলে জনসাধারণের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হবে এ দেশের পোল্ট্রি শিল্পের মতোই দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে মৌ-চাষের কার্যক্রম এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নি:সন্দেহে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে এই মৌ-শিল্প।

১১) মৌ-পালনের উপকারিতা সম্পর্কে রেডিও ও টিভি প্রোগ্রাম প্রচার : দারুনভাবে অর্থনৈতিক চাপ সম্পন্ন দেশের প্রচার মাধ্যমগুলোর একটি বিরাট সময় ব্যয় হয় শুধুমাত্র বিনোদনের নামে অপসংস্কৃতি দিয়ে। সেক্ষেত্রে মৌ-পালন, পোল্ট্রি, ডেইরী, গবাদি পশু মোটাতাজাকরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে এমন বিষয়ে প্রতিদিনই হাতে কলমে শিক্ষার একটি প্রোগ্রাম রাখা আবশ্যক। যা থেকে মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যক্তিগতভাবে সফল ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত হয়ে জানাবেন তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সফলতার পিছনের মূল অনুপ্রেরণার কথা। তাহলে গণমাধ্যম হতে গণমানুষ উপকৃত হতে পারবেন। "মাটি ও মানুষ" সন্ধ্যার পর হতে রাত ১০টার মধ্যে কোন একটি সময় বেছে নিয়ে প্রয়োজনীয় সময় নিয়ে নিয়মিত প্রচার করা দরকার।

তাহলে সত্যিকার অর্থে মানুষ উপকৃত হবে। বিগত ২০০১ এর একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল মাশরুম চাষের উপর একটি প্রতিবেদন প্রচার করেন রাত ৮টার সংবাদের পরপর। এতে দেখানো হয় একজন তরুণ মাসে ১০০০০/- টাকা আয় করছেন ঘরে বসে। পরদিন সাভারের মাশরুম কেন্দ্রে কয়েকশ লোকের ভীড় হয়েছিল শুধু চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে জানার জন্য। প্রচার-প্রচারণার ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিকাশ আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। সুতরাং বিটিভির প্রচারণার উত্তম সময়টি (পিক আওয়ার) অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য বরাদ্দ রাখতে চাই। যেমন- উৎপাদন প্রক্রিয়া, পুঁজির পরিমাণ, আয়-ব্যয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা ও বিপনন ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, উৎপাদিত পণ্যের মূল্যায়ন- অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এর ভূমিকা। এভাবে যদি কৃষিজাত শিল্পটির সম্ভাবনার সকল দিক নিয়ে জাতীয় প্রচার মাধ্যমে আলোচনা উঠে আসে তাহলে আশা করা যায় যে, শ্রোতাদের মধ্য হতে প্রাণবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ ও ধারণা লাভের ফলে অনেকে এগিয়ে আসবে।

১২) মৌমাছির মাধ্যমে সফল পরাগায়ন ও বিষমুক্ত পরিবেশ সম্পর্কে ধারনার অভাব : উপকারী কীটপতঙ্গের মাধ্যমে সফল পরাগায়নের ফলে ফসলের উৎপাদন ক্ষেত্র বিশেষে প্রায় দেড় থেকে দুই গুণ বেড়ে যায়। সুতরাং এটা মোটেই উপেক্ষার কোন বিষয় না। বিগত ২০০০ সালে মূলা বীজ উৎপাদনকারীরা শুধুমাত্র পরাগায়ন ঘটানোর জন্য প্রায় ১০,০০০/- টাকা ব্যয় করে ৩০টি মৌমাছির কলোনী এক মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে যায় বাংলাদেশ মৌ-পালক সমিতি, দিনাজপুর থেকে এবং এই ব্যয়ের পরেও তারা সেইবার প্রচুর ফলন পেয়েছিল পুষ্ট বীজের। বলাবাহুল্য যে, পরাগায়নের সফলতার হার দেখে বীজ উৎপাদনকারী চাষীগণ নিজেরাই এখন মৌ-পালন শুরু করেছেন। এভাবে মৌমাছির অবাধ বিচরণের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হবে বিষ তত কমে আসবে এবং সচেতনতা সৃষ্টি হবে কৃষকদের মাঝে। ফলে বিষমুক্ত শাকসব্জি আমরা পাব, রক্ষা পাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য। সুতরাং পরিবেশবাদী আন্দোলনের বিরাট সহায়ক শক্তি হলো মৌমাছি ও মৌ-পালকগণ।

১৩) সামাজিক মর্যাদা বোধের সমস্যা : মধু সম্পর্কে খোদ আল্লাহতায়ালা বলেছেন, "শিফা উল্লীন্নাছ" এটা মানবজাতির জন্য রোগের আরোগ্যকারী। হাদীছে আছে- "যে শারীরিক নিরাপত্তা চায় তার কিছু মধু খাওয়া উচিৎ"। কোরআন ও হাদীসে এতোবড় গ্যারান্টি থাকা সত্ত্বেও মধু উৎপাদনের এই মহৎ পেশাটির সঙ্গে যারা জড়িত তারা এখনও সামাজিক দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এ মানসিকতার পরিবর্তন দরকার। ব্যক্তিবর্গকে আরও বেশি বেশি করে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। মৌমাছি পালন রূপলাভ করবে পূর্ণাঙ্গ শিল্প। মধুর উপকারীতার কথা সকল ধর্মেই বলা আছে। সুতরাং এটা যারা উৎপাদন করছেন তারা একটি মহৎ পেশাকেই বেছে নিয়েছেন : স্রষ্টার অকৃপণ হাতে দেয়া নেকটার ফুলের সঙ্গে অযত্নে ঝড়ে যাচ্ছিল মাঠে। এটা যারা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সংগ্রহে তৎপর তারা দেশ ও জাতির বন্ধু। যদিও মৌমাছির বাক্স বহর দেখে গ্রামের মানুষেরা ঠাট্টা করে বলে সাপুড়িয়া এসেছে। তথাপি সেদিন খুবই কাছে যখন এর উপকারিতা বুঝতে পেরে তারাই একদিন মৌ-পালক সাজবে।

১৪) উচ্চতর প্রশিক্ষণের অভাব : প্রশিক্ষণ মৌমাছি পালনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য একটি উপাদান। কিন্তু এদেশে মৌ-পালকগণ দুঃখজনভাবে অবহেলিত। ইউরো-আমেরিকায় অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে মৌমাছি পালনকে কেন্দ্র করে। তাদের দক্ষতার গুণে তারা মৌ কলোনী হতে ২৫০ টাকা/কেজির মধু শুধু নয় বরং ১২ ডলার/কেজি পোলেন, ২০ ডলার/কেজি প্রপোলিস আর ৪০ ডলার/কেজি রয়েল জেলী উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে। রাণী মৌমাছি উৎপাদন করা হচ্ছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এবং বিক্রি হচ্ছে প্রতি রাণী ৮ থেকে ১৫ ডলার মূল্যে। তৈরি হচ্ছে হানি কেন্ডি, হানি সোপ, হানি ফ্রেস ক্রিম, মোম, ক্যান্ডেল, কম্ব হানি, ক্রীমড হানি সহ নানা রকম পণ্য। সুতরাং মৌ-পালনের সাথে সম্পৃক্ত জনশক্তিকে আরও দক্ষ করে গড়ে তুলতে মান অনুযায়ী সরকারি সহায়তা প্রয়োজন। সুখের কথা ইতোমধ্যে বহু উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি মৌমাছি পালনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। তাদেরকে বাছাই করে যারা আগ্রহী সে সকল ব্যক্তি বর্গকে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য দেশের বাহিরে পাঠালে তা অপচয় হবে না বরং তারা আমাদের সম্পদ হবে। উন্নত বিশ্বে এপিথেরাপী একটি প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে ইতোমধ্যে তার জায়গা দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো শূন্যের কোঠায়। বিশ্ব জুড়ে প্রতি এক বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয় এপিমেডিয়া (ওয়ার্ল্ড বী কিপিং কংগ্রেস)। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে আমরা কেউ তাতে অংশগ্রহনের সুযোগ পাইনা। এশিয়ান এপিকালচার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে জাপানের তামাগোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রতি দু'বছর অন্তর অনুষ্ঠত হয় ৫দিন ব্যাপি কর্মশালা, আলোচনা সভা ও প্রদর্শনী। এতেও আমাদের কোন অংশগ্রহণ নেই। এ ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের যোগ্য ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ কৃষি বিভাগের দায়বদ্ধতা এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি।

উপসংহার

উপরিউক্ত সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে মৌ-চাষ অবশ্যই দেশের অর্থনৈতিক খাতকে সমৃদ্ধ করতে পারবে। আমাদের অভ্যন্তরীণ মধুর চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও মধু রপ্তানী করতে সমর্থ হবো। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে এ শিল্পটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারবে। বেকার অনেক যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। মধু ও মোম ও মৌ-চাষকে কেন্দ্র করে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে উঠবে। সে লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারীভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষিত বেকার শ্রেণিকে মৌ-চাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মৌ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সহজ লভ্য লোনের ব্যবস্থা করতে হবে। পর্যাপ্ত ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তুলতে হবে। এভাবে আমরা এক সময় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সক্ষমতা লাভ করতে পারবো বলে আমি মনে করি।

★ *প্রবন্ধকার :* প্রকল্প কর্মকর্তা, সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

দূর ও নিকট বন্ধু লেসার

সুব্রত কুমার সাহা

১৯৬৯ সাল আমাদের বিজ্ঞান ইতিহাসে অন্যতম উজ্জ্বল দিন। চাঁদে সে বছর মানুষ প্রথম পা রেখেছিল। চাঁদের পিঠের ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে মানুষ। পাথর খন্ড তুলে এনেছে। গবেষণা হয়েছে অনেক। জাদুঘরে সেই পাথরের টুকরো আজও শোভা পাচ্ছে। এই বাহিরজোড়া হই চইয়ের ভেতর নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছিলেন দুদল বিজ্ঞানী। দুই গবেষণাগারে। লিক অবজারভেটরি, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়- গবেষণাগারের প্রথম ঠিকানা। ম্যাকডোনাল্ট অবজারভেটরি, টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়- গবেষণাগারের দ্বিতীয় ঠিকানা। অবজারভেটরি মানেই মহাজগতের সাথে বিজ্ঞানীদের আলাপচারিতা। মাধ্যম হিসেবে থাকে দূরবিন। এমন দুই বড়ো দূরবিনে ছোট্ট ছোট্ট যন্ত্রাংশ বসানোর কাজ করছিলেন বিজ্ঞানীরা। চাঁদে অভিযান হয়ে গিয়েছে দিন দশেক হল, লিক গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এক কান্ড করে বসেলন। কোথায় কত দূরে চাঁদ! তার পিঠের উপরের যন্ত্রে যে প্রতিফলক রয়েছে, সেই প্রতিফলকের পিঠে পৃথিবী থেকে একটা ছোট্ট আলোকসংকেত বার্তা হিসেবে পাঠালেন। বড়ো কথা, বার্তাটা ঠিক প্রতিফলকের উপরে গিয়েই পড়ল। ম্যাকডোনাল্ডও কম যায় না, দিন কয় পর তাঁরাও একই কাজ করতে পারলেন। কি করে হচ্ছিল এসব? দূরবিনের ভেতর রুবি কেলাস দিয়ে লাল আলো তৈরি হচ্ছিল। লাল বললে হবে না, তীক্ষ্ম গগণভেদী লাল আলোর রশ্মি। সোজাসুজি দূরবিন থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে পৌছেছে। কতদূরে চাঁদ- দু'লক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে। প্রতিফলকে পৃথিবী থেকে পাঠানো আলো পড়লে কি হবে? প্রতিফলিত হবে। হয়েছেও তাই। আবার পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে রওয়ানা দিয়েছে। বিস্ময়ের, দূরবিনের কাছাকাছি বসে থাকা বিজ্ঞানীরা দেখলেন, ওই লাল আলো চাঁদের প্রতিফলক থেকে ধাক্কা খেয়ে এক সেকেন্ডের একটু বেশি সময় পর পৃথিবীর এলাক উৎসে 'এসে গেছি এসে গেছি' বলে সাড়া দিচ্ছে। দু'জায়গাতেই একই ঘটনা ঘটছে। দূরত্ব আর সময়ের খেলা আমাদের কাছে নতুন নয়, শক্তও নয়। ভাগাভাগি করে দেখা গেল, সত্যিইতো ওই লাল আলো চাঁদের দূরত্ব অব্দি যাতায়াত করেছে। সব থেকে অবাক হবার মতো ঘটনা, দূরত্বের মাপ এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক হচ্ছে না! এই আলোকে আমরা আর পাঁচটা আলোর মতো করে ভাবতে পারছি না। নাম দিয়েছি আমরা 'লেসার আলো'। এখন টিভি খুললেই যতোসব আজগুবি জাগতিক-মহাজাগতিক কান্ডকারখানা দেখা যায়। সেখানে উদ্ভট রকমের সব যন্ত্রপাতি আর তাদের বাহাদুরি দেখা যায়। একটা বাহাদুরির নাম 'লেসার'। এখান ওখান থেকে যখন তখন তীব্র আলোর রেখা কাউকে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, কাউকে বা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে। লেসার বলতে একটা লম্বা কথার বনসাই রূপ। লাইট অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড ইমিশন অফ রেডিয়েশন। প্রথম অক্ষরগুলো পর পর সাজালে দাঁড়ায় 'লেসার'। এল.এ.এস.ই.আর। কথায় বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। এখানে, আলো দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আলো জোরদার করা হয়। তারপর সেই আলোর নাম দাঁড়ায় 'লেসার'। কেমন করে খোঁচাতে হয়, পরে বলা যাবে'খন।

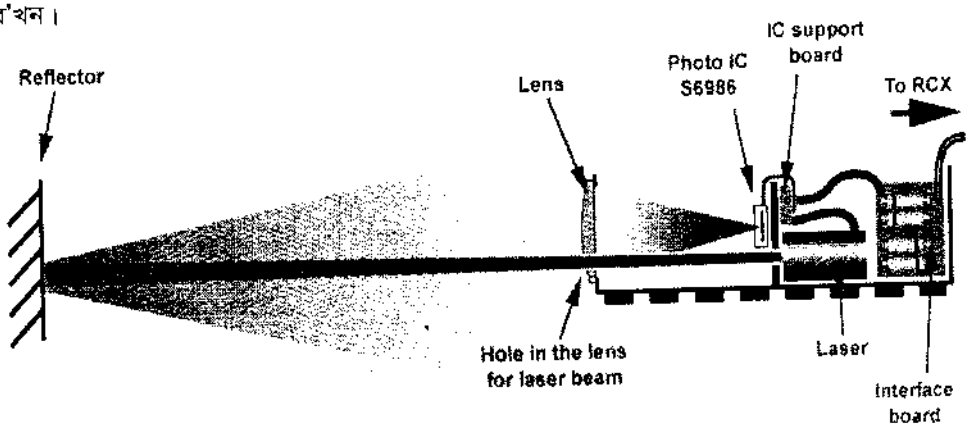

এখন টিভি খুললেই যতোসব আজগুবি জাগতিক-মহাজাগতিক কান্ডকারখানা দেখা যায়। সেখানে উদ্ভট রকমের সব যন্ত্রপাতি আর তাদের বাহাদুরি দেখা যায়। একটা বাহাদুরির নাম 'লেসার'।

লেসার আলোর জোর খু-ও-ব বেশি। বেশি কেন? আর আলোর জোর-ই বা মাপা হয় কেমন করে? এক বর্গ মিটার জায়গায় কত ওয়াট আলো পড়ছে, তা দিয়ে আমরা আলোর জোর বুঝি। সাধারণ বাল্ব, আমরা যা ঘরে ব্যবহার করি, তার আলোর একটা মাপ লেখা আছে। চল্লিশ, ষাট, আশি ওয়াট- এসব। দেখা গেছে এক/দুই মিলিওয়াট আলোতেও লেসারের কাজ চলে যায়। বলে কি! একটা বাল্ব যেখানে চল্লিশ ওয়াট সেখানে একটা এক বা দুই মিলিওয়াটতো কর্তব্যই নয়। তবে খুব জোর আলো হলো কেমন করে? আসলে দেখতে হবে আমাদের, যে আলোর কথা বলছি, সে কতটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ছড়িয়ে পড়ছে না কি একটা ছোট্ট জায়গায় সরাসরি পড়ছে। আর সব ল্যাম্পের আলোর তুলনায় লেসারের একটা বড় গুণ সে রওয়ানা দিয়েই দিক ভ্রান্ত হয় না, নিজেকে ছড়িয়েও দেয় না। পঞ্চাশ মিটার পর্যন্ত লেসার একটুও না ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগোয়। বাল্বের আলো বাল্বের গা থেকেই ছড়াতে থাকে। ঘরের একোন-ওকোন আলোকিত করে। ফলে উৎসে আলোর জোর থাকলে হবে কি। ছড়িয়ে গিয়ে পুরো ব্যাপারটাকেই কেউ ভেস্তে দেয়। ভেস্তে দেয়ার কথা বলব না। বলা উচিত হবে না। বাল্বের এক কাজ। লেসারের অন্য কাজ। কারও চেয়ে কারও কাজ ছোট নয়। দরকারের জায়গাটা শুধু আলাদা। একটা অঙ্ক দিই তোমাদের। খুব ছোট্ট অঙ্ক। করে দেখো। উত্তরটা আমরা বলে দিচ্ছি। পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা বাল্ব (ধরা যাক চল্লিশ ওয়াট) আর একটা দুই মিলিমিটার ওয়াটের লেসার প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে কত ওয়াট আলো ফেলতে পারছে। ফল কি জানোতো? বাল্ব ফেলতে পারে এক ওয়াটের এক কোটি ভাগের এক ভাগ। আর এই এতোটুকুন দুই মিলিমিটারের লেসার ফেলতে পারে এক ওয়াটের পনেরো ভাগের এক ভাগ। এই বাল্ব আর লেসারের কথা আমাদের নিজেদের জীবনে কাজে লাগাতে পারলেও ভালো হয়।

বলছিলাম বিজ্ঞানের কথা। এমন সমাজের কথায় হুটহাট চলে যাওয়া যায় না। আরও একটু 'লেসার' চরিত্র বর্ণনা কর। 'লেসার'-এর কি কি গুণ রয়েছে। প্রথম কথা হল, লেসার আলোর একটাই কম্পাঙ্ক থাকে। 'বিশুদ্ধ আলো' বলতে পারো। যে কোনো আলোতে তো নানা কম্পাঙ্কের মাখামাখি থাকে। সেখান থেকে ঠিকঠাক উপায়ে একটা কম্পাঙ্ককে আলাদা করতে হয়। সেই কম্পাঙ্ক লেসার হিসেবে কাজে লাগানো হয়। চাঁদে লাল আলো পাঠিয়েছি, আর কোথাও চাইলে নীল আলো পাঠাতে পারি। রঙধনুর যে সাত রঙ, চাইলে যে কোন রঙের, মানে আমরা বলতে চাইছি, যে কোন কম্পাঙ্কের লেসার বানানো যায়।

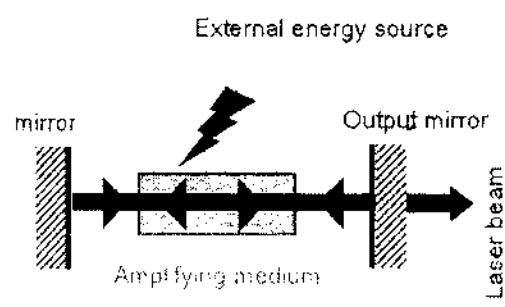

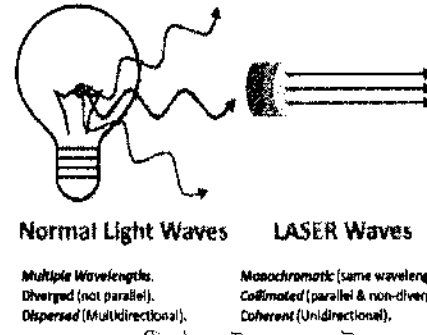

যেকোনো আলোতে তো নানা কম্পাঙ্কের মাখামাখি থাকে। সেখান থেকে ঠিকঠাক উপায়ে একটা কম্পাঙ্ককে আলাদা করতে হয়। সেই কম্পাঙ্ক লেসার হিসেবে কাজে লাগানো হয়।

এমনি যে সব সাত-পাঁচ আলো রয়েছে, এরাতো ঢেউয়ের মিছিল ছাড়া আর কিছু নয়। ঢেউয়ের মিছিল, এক ঢেউ অন্য ঢেউয়ের গায়ে আছড়ে পড়ছে। কোন ঢেউয়ের মাথা কোন ঢেউয়ের পায়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে। কোন ঢেউ পাশের ঢেউয়ের গায়ে হেলে পড়ছে। এই সব আর কি। লেসারের ঢেউ চরিত্র পুরো আলাদা, ঢেউগুলো সব পালতোলা এক সার নৌকার মতো লাইনে চলে। একেবারে লাইনে। বোধহয় তোমরা ১৬ই ডিসেম্বর জাতীয় প্যারেড স্কোয়ারে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখেছো, সবাই এক সুরে কথা বলে, একটুও পান থেকে চুন খসে না; লেসারের ঢেউ তেমন। এখন দৈনন্দিন কাজে লেসারের উপকারের কথা বলে শেষ করা যায়

না। এক ফালি লেসার আলো প্রায় দশ হাজার টেলিফোন তারের সমান কাজ করে। চোখের রেটিনা জুড়ে দেবার অপশনে কাজ করে। ভেতরে গজিয়ে উঠা টিউমার কেটে বাদ দেয়া যায়। যে জমিতে সহজে পৌঁছুনো যায় না, তার ছবি তুলে নেয়া যায়। কমপ্যাক্ট ডিস্কের ছড়াছড়ি এখন। লেসার ছাড়া এই জিনিস তৈরিই হয় না। দোকানে গিয়ে তোমার পছন্দমতো জিনিস তুলে নিচ্ছ। বেরোতে গিয়ে যদি কেউ কেউ সাম না মিটিয়ে দেয় (ইচ্ছে করেই বলছি না, ভুলও তো হতে পারে) তবে দরজা দিয়ে বেরোতে গেলেই বাধা। সবাই ফিরে থাকবে, কি লজ্জা! কি লজ্জা! লজ্জার কি হল। বড় বড় চুরি ডাকাতি তো এদিয়েই রুখে দেয়া যায়।

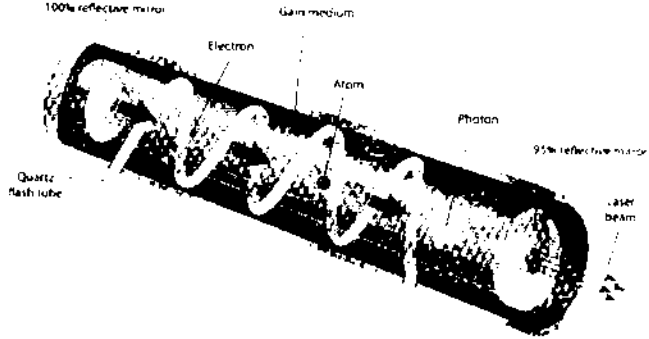

লেসার কীভাবে কাজ করে

এমন ছোট্ট হতে পারে লেসার যে খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণের তলায় রেখে দেখতে হয়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, বিজ্ঞানে আবার বিশ্বাসের কদর কি!

অর্ধপরিবাহীর ছোট্ট ছোট্ট চিপে কয়েক হাজার লেসার বসানো থাকতে পারে। লেসার যদি বড়ো সড়ো হয় তবে তার হাতির খাবার লাগে। মানে কি? খাবার বলতে তো বিদ্যুৎ। একটা ছোট্ট শহরের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে যেমন বিদ্যুৎ লাগে, একটা বড়ো আকারের লেসারের খাবারও তাই।

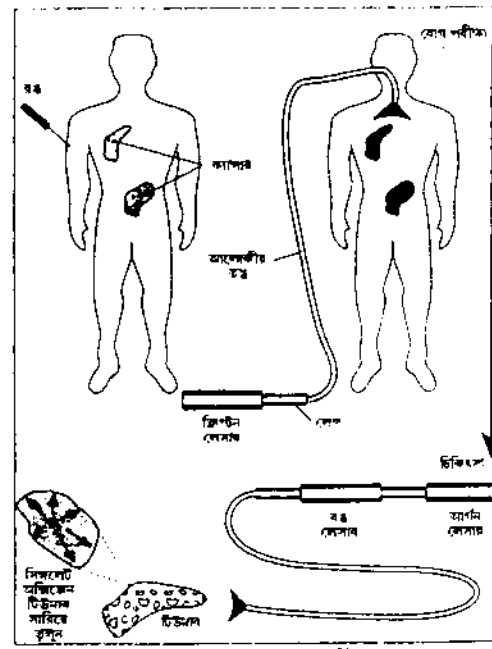

লেসার সাহায্যে ক্যান্সার নিরাময়

লেসার নিয়ে আরও অনেক কথা বলারই সাধ রইল। তার উদ্ভাবনের কথা এবার বলে নিতে চাইছি। ১৯৬০ সালের ১৬ই মে। তাঁর নাম তিয়োডোর মাইমান। ক্যালিফোর্নিয়ার হিউজেস অ্যায়ারক্রাফট কোম্পানিতে প্রথম লেসার চালালেন। রুবি কেলাসের তৈরি লেসার। লম্বায় সে এক ইঞ্চি, ব্যাস এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ। কাচের তৈরি একটা প্যাঁচানো নলের ভেতর তাকে বসানো হয়। লম্বাটে কেলাসের দুটো মাথায় রূপোর আস্তরণ ছিল। তড়িৎ সংযোগ করে প্রাণ সঞ্চার করতেই জন্মাল লাল আলোর ঝলকানি। হ্যাঁ, লাল আলো, যাকে ঠিকঠাক 'লেসার' বলতে কিছুটা সময় নিয়েছে। যার কথা পৃথিবী জানতোই না, তাকে আর কি করে খুব সহজে পাওয়া যায়! লেসার-এ যাবার আগে একটা পূর্ব অধ্যায় ছিল। এক দশক আগের অধ্যায়। ১৯৫১ সালের বসন্ত কালের এক সকাল। নিউইয়র্ক শহরের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন এক বিজ্ঞানী। নাম তাঁর চার্লস টাউনস। ওয়াশিংটনের এক পার্কের বেঞ্চিতে আপন মনে

বলেছিলেন আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সভায় যাবেন আমেরিকার নৌবিভাগ তাঁকে একটা কাজ দিয়েছিল মাইক্রোওয়েভ কাজে লাগিয়ে কি করে যোগাযোগ আরও বাড়ানো যায়। এমন যন্ত্র রয়েছে। তবে চেহারাটা মোটাসোটা ধরনের মাইক্রোতরঙ্গের উপর দিকের কম্পাঙ্ক গুলোকে এর ভেতর বসানো যায় না।

বাগানে একা বসে থাকলে কত কথা মনে আসে। তিনি কিনা ডুবে গেলেন বিজ্ঞানের ভাবনায়। 'অণু'র গড়নের কথা মনে পড়ল। ভাবছেন, আচ্ছা, এমন কি করা যায় না যে কোন একটা জানা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দিয়ে কোন অণুকে ঘা দিলে যে কম্পাঙ্কটা বেরিয়ে আসবে তা ঘা দেয়া আলোর কম্পাঙ্কেরই সমান? উপরের দিকে বেশি শক্তির অণু আর নিচের দিকে কম শক্তির অণু চালান করে দিলে এজিনিস করা যায়। করে দেখার আগে ১৯৫১ সালের মে মাসে একটা সম্মেলনে টাউনস কথাটা বললেন। কথাগুলো কলাম্বিয়া রেডিয়েশন ল্যাব থেকেও ঐ বছরই বেরোল। কলম্বিয়ায় ফিরে এলেন। দুই সহকর্মী রয়েছেন সেখানে। হার্বার্ট জিগার আর গবেষক ছাত্র জেমস গর্ডন। তিন জনই লেগে গেলেন কাজে। আগে তো গ্যাস বানানো চাই, রাসায়নিকের গ্যাস নয়। এমন গ্যাস যা দিয়ে পদার্থবিদ্যার এই বিশেষ গবেষণা হবে। গ্যাসের গঠন কিছু পাল্টে যায় না এতে। অ্যামোনিয়া দিয়ে কাজ শুরু করলেন তিন জন। তা উঁচু কম্পাঙ্কের মাইক্রোওয়েভতো বেশ পাওয়া যাচ্ছে নৌ বিভাগতো চেয়েছিল তাই। নাম দেয়া হল তার মেসার।

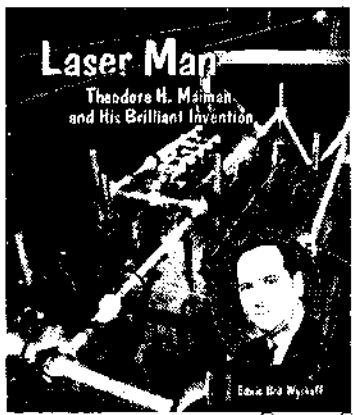

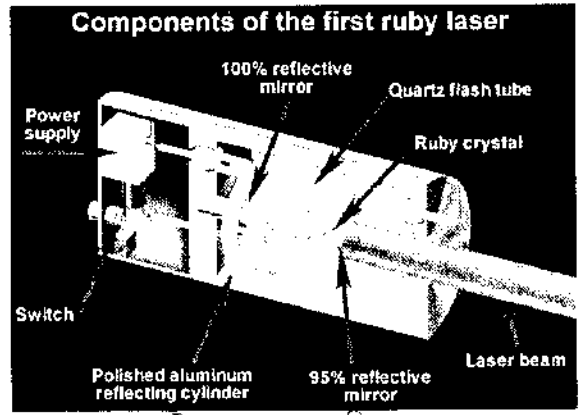

লেসারের আবিষ্কারক থিয়োডোর হ্যারল্ড মাইমান এবং প্রথম রুবি লেসার

লেসার নয়, মেসার মেসার কথাটা এল কোত্থেকে! মাইক্রোওয়েভ অ্যামপ্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড ইমিশন অফ রেডিয়েশন। এম.এ.এস.ই.আর। কোথাও কি আর এই নিয়ে কাজ হচ্ছিল না? হচ্ছিল। মেরিলান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন যোসেফ ওয়েবার। ১৯৫২ সালে পাঠানো তাঁর একটি পেপার ১৯৫৩ সালের জুন মাসে ছাপা হয়ে গেল। শিরোনাম ছিল 'দি পসিবিলিটি অফ অ্যামপ্লিফিকেশন অফ মাইক্রোওয়েভস বাই সিস্টেমস নট ইন ইকুইলিব্রিয়াম'। মস্কোতেও কাজ করছিলেন দুই বিজ্ঞানী। বলা দরকার, লেসারের অন্যতম স্রষ্টা এই দু'জন। আলোকজাণ্ডার প্রকোরভ আর নিকোলাই বাসভ। মস্কোর লেবেদেফ ফিজিক্স ইনস্টিটিউটে কাজ করছিলেন ওঁরা। একটা কথা বলতেই হয়, অনেক বিজ্ঞানীর চেয়ে আমরা আইনস্টাইনকে আলাদা করে দেখি কেন? সকল উদ্ভাবনারই প্রায় পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। এই মেসার-এর ধারণাও আইনস্টাইনের নীতি থেকেই তৈরি হয়েছে।

এই বিজ্ঞানীদের জীবন কাহিনী বোধহয় একটু একটু বলতে পারলে ভালো হয়। থিয়োডোর হ্যারল্ড মাইমানের কথা প্রথমে বলি। ১৯২৭ সালে জন্ম। বাবা তাঁর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মাইমান নৌ বিভাগে কিছুকাল কাজ করেছেন। কলারেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি-পদার্থ বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেন। স্ট্যানফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। মায়ামির হিউজেস রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে ১৯৫৫ সালে চাকুরি নেন দু'বছর আগে, ১৯৫৩ সালে, টাউনস-এর হাতে মেসার তৈরি হয়ে গিয়েছে। মাইমান তার একটা উন্নত রূপ তৈরি করেন। ১৯৬০ সালে প্রথম লেসার বানালেন, সে কথা আগেই বলেছি। পরের বছর বেল টেলিফোন ল্যাব থেকে জাভান নামের একজন গবেষক 'কনটিনোয়াস ওয়েভ লেসার' তৈরি করেন। ১৯৬২ সালে মাইমান হিউজেস ল্যাব ছেড়ে দেন কোরাড কর্পোরেশনে যোগ দেন। অনেক মাইনে পাবেন। মাইনে

নয় শুধু, কাজের সুবিধেও বেশি। আজ আমরা জানি, এই কোরাড কর্পোরেশন কতোরকম লেসার যন্ত্র তৈরি করে! ১৯৬৮ সালে নিজেই 'মাইমান অ্যাসোসিয়েটস' তৈরি করেন। ১৯৭২ সালে তাঁর উদ্যোগেই লেসার ভিডিও কর্পোরেশন তৈরি হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে টি.আর.ডব্লিও ইলেকট্রিক্স-এ রয়েছেন।

টাউনস-এর (১৯১৫) জীবন কথায় আসি তা হলে। বাবা ছিলেন আইনজীবী ফুরমান ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা সেরে ক্যালটেকে যোগ দিয়েছিলেন। জানো তোমরা, পৃথিবীর অন্যতম সেরা শিক্ষাকেন্দ্র ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। ছোট করে সবাই ক্যালটেক বলেন : যাইহোক, এর পর তিনি বেল ল্যাবে যোগ দেন। যুদ্ধের সময় রাডার গবেষণায় যোগাযোগ ছিল।

কোথায় বোমা মারতে হবে, সেই সব লক্ষ্যবস্তু রাডার দিয়ে খুঁজে বেড়াতেন। ১৯৪৭ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৬১ থেকে ৬৭ সাল পর্যন্ত ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এম.আই.টি)-তে ছিলেন। পরে বার্কলে প্রাঙ্গণের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন।

নিকোলাই বাসভ (১৯২২-২০০১) লালফৌজের সদস্য ছিলেন। নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারপর মস্কোতে এসে লেখাপড়া করেন। ১৯৫৬ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি হয়। ওখানেই থেকে যান। ১৯৬২ সালে বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হল। বাসভ আর প্রোকারভ (১৯১৬-২০০২) একসাথে মিলে 'লেসার' নিয়েই কাজ করেন। নানা সক্রিয় গ্যাস মাধ্যম তৈরি করে বিকিরণ প্রাণালী লক্ষ্য করেন। ১৯৫৫ সালে স্বাধীনভাবে সাফল্য অর্জিত হয়, মেসার যন্ত্র তৈরি করে ফেলেন ওঁরা। ফলে ১৯৬৪ সালে বাসব, প্রোকারভ আর টাউনস একসাথে নোবেল লাভ করেন। বছর তিন সময় লাগে। ১৯৫৫ সালের পর ১৯৫৮ সালে দুই দু'জনের হাতেই লেসার তৈরি হয়। অর্ধপরিবাহী কেলাস কাজে লাগিয়ে লেসার তৈরির কৃতিত্বও এই দুই বিজ্ঞানী অর্জন করেছেন। আজকাল কতোরকমের নাম লেজারের! যে মাধ্যমে তৈরি হয় তার ভিত্তিতে নামগুলো আলাদা হচ্ছে। নইলে সলিড লেসার, গ্যাস লেসার, লিকুইড লেসার, অর্ধপরিবাহী লেসার, এসব নাম হত না। রুবি কেলাসের কথা ভাবো। এরকমের সলিড কেলাস। অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে তৈরি, ফাঁকে ফাঁকে অবিশুদ্ধি হিসেবে ক্রোমিয়াম অক্সাইড থাকে। এমন প্রচুর কেলাস রয়েছে। টাংস্টেন, মলিবডেনাম, বেরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি কাজে লাগানো যায়। নিউডিবিয়াম কেলাসের বলয়ে অবিশুদ্ধি হিসেবে 'বিশুদ্ধ কাচ' কাজে লাগানো চলে। এখানে কাচের বদলে ক্যালসিয়াম টাংস্টেটও অবিশুদ্ধি হিসেবে নেয়া যায়। বলা দরকার অবিশুদ্ধি না থাকলে লেসার বানানো হয়ে উঠবে না।

আজকাল কত রকমের নাম লেজারের! যে মাধ্যমে তৈরি হয় তার ভিত্তিতে নামগুলো আলাদা হচ্ছে

১৯৬০ সালে যখন প্রথম লেসার তৈরি হল, তখন পৃথিবীর নামকরা বহুজাতিক ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন (IBM) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের কেলাসে ইউরেনিয়াম অবিশুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কেলাস বানিয়ে ফেলল। গ্যাস লেসারেরও নানা নাম আছে। হিলিয়াম-নিয়ন গ্যাস লেসার রয়েছে : যেখানে দশ ভাগ হিলিয়ামের সাথে এক ভাগ নিয়ন মেলানো হয়। তেমনি রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস লেজার। এখানে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছাড়াও নাইট্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ নেব। কোনটা কতটা থাকে? শতকরা দশভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড, দশভাগ নাইট্রোজেন আর বাকি আশি ভাগ হিলিয়াম। যদিও লেসারকে বিদ্যুৎ

সময়ে জানিয়ে দেওয়া হয়, কখনও কখনও কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া কাজে লাগিয়েও এজিনিস করা যায়। এদের প্রমরা 'কেমিক্যাল লেসার' বলি। এমন কেমিক্যাল লেসার বানানো যায় যার ঢেউ এক বিলিয়ন ওয়াট শক্তি দিয়ে তৈরি

লিকুইড লেসারও আই.বি.এম এর-ই ফসল। ১৯৬৬ সালে তৈরি হয়। লিকুইড লেসার না বলে, বলা ভালো, লিকুইড ডাই লেসার। একগুচ্ছ রঙ পৃথিবীতে রয়েছে যারা লেসার তৈরি করতে পারে। ২৫০ থেকে ১৮০০ ন্যানোমিটার লেসার তৈরি করতে পারে। দু'একটা নাম বলি। যেমন রোডামিন ৬ জি লেসার। ৫৭০ থেকে ৬৫৫ ন্যানোমিটার তৈরি হয়

অর্ধপরিবাহী লেসারের উদ্দোক্তা পল গোরলে ও তাঁর সহকর্মীরা। সান্ডিয়া ন্যাশনাল ল্যাবে তৈরি করেছেন। এক টুকরো ছোট্ট চিনিদানার আকারে এই অর্ধ পরিবাহী লেসার তৈরি করা যায়।

তামা, অ্যালুমিনিয়াম, সোনা এরা হল পরিবাহী। প্লাস্টিক, কাঁচ, রাবার- অপরিবাহী। অর্ধপরিবাহী মানেইতো এর মাঝামাঝি। একে আমরা মাঝে মাঝে 'ডায়োড লেসার' হিসেবেও চিনি। দু'রকম ধর্মের অর্ধপরিবাহী পদার্থ এখানে জুড়ে দেয়া হয়। একটার ভেতর n-টাইপ অবিশুদ্ধি থাকে। অন্যটির ভেতর p-টাইপ অবিশুদ্ধি থাকে। একটা উদাহরণ দিই। গ্যালিয়াম অ্যালুমিনিয়াম আর্সেনাইড। ৭৫০ থেকে ৯০০ ন্যানোমিটার তরঙ্গ তৈরি করে

মহাজাগতিক গবেষণায় লেসার ছাড়া এক পা-ও এগোনো যায় না। লেসার আলোর একটা বিশেষ ধরন আছে। সে উৎস থেকে একটানা বেরোয় না। থেকে থেকে বেরোয়। বুঝতে আমাদের অসুবিধে হবার কথাই নয়। নিজের শরীর দিয়ে বোঝা যায়। কখনও কোথাও একটানা ব্যথা করে। কোথাও দপ দপ করে ব্যথা করে। দপ দপ করে ব্যথা মানে কি? ব্যথা হচ্ছে, আবার একটু থেমে গিয়ে ব্যথা হচ্ছে। একটানা হচ্ছে না। লেসার অনেকটা দপ দপ করে ব্যথা করার মতই তুলনীয়। এরকম হলে সবকাজ তো চলবে না। কিছু গবেষণা ও অনুসন্ধানে একটানা লেসার চাই। মহাজগতে কিছু খুঁজতে চাইলে চাই। NASA এই কাজ করে ফেলল। আর্গন লেসার নিল। ১৯৬৮ সালে বছরের শুরুতে মহাকাশযান XXXVI তে লেসার পাঠাল। এই লেসার উপরে গিয়ে নিজের জাত পাল্টাল। রেডিও তরঙ্গ হল। নিচে যা খবর ফেরত পাঠাতে হবে রেডিও তরঙ্গের আকারেই ফেরত এল। একটানা লেসার তৈরি করার যন্ত্র বেল ল্যাব-এ বিজ্ঞানী আলি জাভান ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে তৈরি করেন। আলি জাভান প্রধান। সাথে ছিলেন দু'জন। উইলিয়াম বেনেট জুনিয়র আর ডোনাল্ড হেরিয়ট। একটানা লেসার পেতে চাইলে দু'খানা গ্যাসের মিশ্রণ নিতে হয়। ওঁরা হিলিয়াম-নিয়ম লেসার বানিয়েছিলেন।

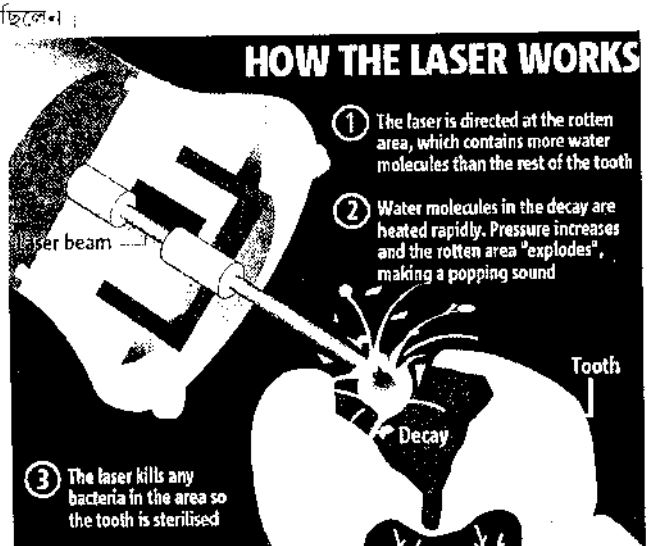

একটা মজার কথা জানাই। একটানা লেসার লাভের আশায় কাজ করছিলেন হেরিয়ট আর বেনেট। জাভান তখন নিউইয়র্ক গিয়েছেন। বিকেল বেলা জাভান বেল ল্যাবে ফোন করেছেন। উল-সিত দুই বিজ্ঞানী ভেবে

পাচ্ছেন না জাভানকে কি বলবেন। ১৮৭৬ সালের ১০ই মার্চ আলেকজান্ডার গ্রাহামবেল যা বলেছিলেন, তাই বললেন ওঁরা, 'ওয়াটসন কাম হিয়ার। আই ওয়ান্ট ইউ'।

লেসার এসে যোগাযোগের বেলায় অসাধ্য সাধন করে দিয়েছে। একা একা হতো না একাজ। পাশে তৈরি হয়েছে আলোকীয় তন্তু। অপটিক্যাল ফাইবার। খুবই সরু। চুলের মত। অতি উঁচুমানের কাচ দিয়ে তৈরি। নিখুঁত তৈরি হল কিনা, লেসার দিয়েই খুঁচিয়ে দেখতে হয়। শুনে ঘাবড়ে যেও না। আলোকীয় তন্তু কাচ দিয়ে তৈরি হতে পারে। শক্ত সে ইস্পাতের চেয়েও বেশি। প্রতি বর্গ ইঞ্চি ছ'লক্ষ পাউন্ড ভর বইতে পারে। টেলিফোনে এই তন্তু জুড়লে টেলিফোনের ক্ষমতা যে কতগুণ বেড়ে যায় তা কল্পনা করাও চলে না। একটাই শুধু উদাহরণ দিই। কেউ যদি ঠিক করেন, ওয়েবস্টারের আনঅ্যাবরিজড অভিধান কোন কম্পিউটারের সংগ্রহ থেকে অন্য কম্পিউটারে পাঠাবেন, সময় কত লাগবে জানো? ছয় সেকেন্ডেরও কম। ১৯৭৭ সালে শিকাগো প্রথম আলোকীয় তন্তু কাজে লাগায়। দু'খানা বেল টেলিফোন কোম্পানি একজন গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ তৈরি করে। চব্বিশটি তন্তু লেগেছিল সেদিন। এক দেড় মাইল লম্বা তার লেগেছে। দশ মাস একটানা মুখ বুঁজে কাজ করেছে এই যন্ত্র। শুধু একদিন কুড়ি সেকেন্ডের মত বিগড়ে গিয়েছিল। তামার তার থাকলে কি হয়। বছরে দু'ঘণ্টা অকেজো থাকে। ১৯৭৮ সালে ভিজনি ওয়ার্ল্ড-এ প্রথম এমন টেলিফোন লাইন চালু হয়। ১৯৮৮ সালে আমেরিকান টেলিফোন অ্যান্ড টেলিগ্রাফ (AT&T) TAT-8 ক্যাবল বসায়। উত্তর আমেরিকা থেকে ইউরোপ অনায়াসে এখন খবর যাতায়াত করে। ১৯৫৬ সালে তামার তার ছিল। একসাথে ৫১টির বেশি কল নিতে পারত না। মেজে ঘষে ১৯৮৩ সালে সবশেষ তামার ক্যাবল লাইন বসানো হয়েছিল। এই লাইন একসাথে আট হাজার কল বইতে পারত। আলোকীয় তন্তুর বেলায় এই সংখ্যা চল্লিশ হাজার। হ্যাঁ, এক লহমায় চল্লিশ হাজার বার্তা বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

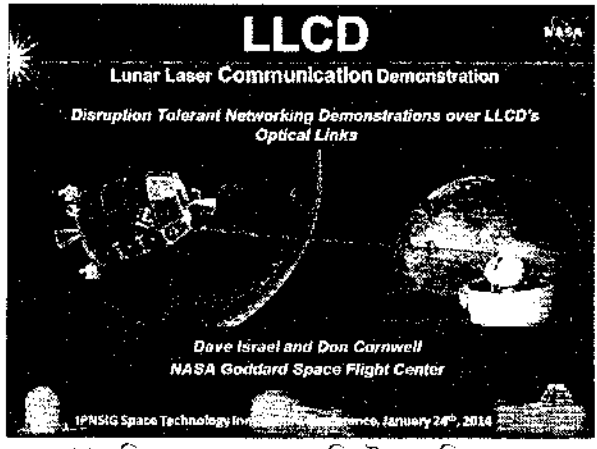

কি কি কাজে লেসার লাগে, প্রথম দিকে আমরা বেশ খানিকটা বলেছি। চোখের নানা অপারেশন আজকাল খুব সহজেই লেসার দিয়ে করা যায়। লেসার আলো চোখের খুব গভীরে গিয়ে যেই এলাকায় ধাক্কা মারবার কথা, সেখানেই ধাক্কা মারে, আশপাশের একটুও ক্ষতি করে না। যার অপারেশন হচ্ছে, একটুও ব্যথা অনুভব করবেন না। নার্সিং হোমে ভর্তিও হতে হয় না। ডাক্তার তাঁর চেম্বারেই করে দিতে পারেন। যেদিন অপারেশন হল সেদিনই তাঁর কাজে নেমে পড়তে পারেন। ছানি কাটানো এখনতো হামেশাই লেসারে হচ্ছে। সোজা কথা, চোখের যাবতীয় রোগে লেসার রাজাধিরাজের মত কাজ করে। শরীরের ভেতর কোথাও টিউমার দেখা দিলে লেসার দিয়ে তাকে কেটে বের করে আনা যায়। দাঁতের ডাক্তার যারা, তারাও নানা কাজে লেসার বাদ দিতে পারেন না। কমপ্যাক্ট ডিস্ক (CD), কমপ্যাক্ট ভিডিও ডিস্ক (CVD) এখনও লেসারেই চলে। একটা লং-প্লেয়িং রেকর্ডের দু'ভাগের একভাগ সাইজ একটা সি.ডি. রেকর্ডের, অথচ এক পিঠে চুয়াত্তর মিনিটের পরিবেশনা রেকর্ড করা যায়। আজকাল পোর্টেবল সি.ডি. প্লেয়ারও পাওয়া যায়। নানা লাইব্রেরিতে আজকাল সিডি-রম (CD-ROM) থাকে। পুরো নাম কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমরি। এর তুলনা নেই।

ন্যাশনাল ডিওগ্রাফি'র মতো পত্রিকার সব বছরের সংখ্যা একসাথে এখন CD-ROM-এ পাওয়া যায়। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত মানুষ এনসাইক্লোপিডিয়া কিনে সংগ্রহের কথা ভাবতেই পারেন না CD-ROM নিলে ঘরের এক কোণে পড়ে থাকবে, এমন কিছু জায়গা দখল করবে না।

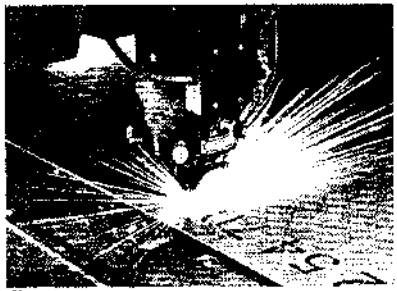
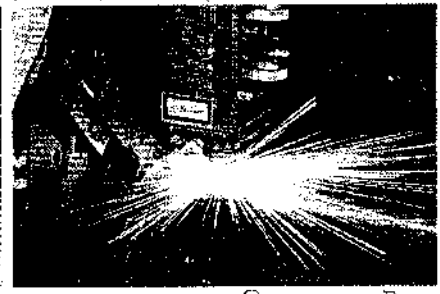

শিল্প ও কলকারখানায় লেসারের প্রচুর সমাদর এখন, তাকে ছাড়া কিছু কাজ চলেই না

শিল্প ও কলকারখানায় লেসারের প্রচুর সমাদর এখন, তাকে ছাড়া কিছু কাজ চলেই না। একটা ছোট্ট ফিল্ম নয়তো সংকর ধাতুর পাতে ০.৪৩ মিলিমিটার সাইজের গর্ত করতে হবে। বিশ্বকর্মার কোন স্ক্রু নেই এমন কাজ করার। লেসার চাই, লেসার ছাড়া এমন মিনি সাইজের গর্ত তৈরি করার কথা ভাবাই যায় না। কতো কাজের কথা বলব। সেনাবাহিনীর লোকেদের লেসারতো লাগেই। এই আলো চোখে দেখা যায় না, গোয়েন্দাগিরি করতে এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে! খুব কাছাকাছি দূরত্ব, যা দেখে চোখে প্রায় ফারাক বোঝাই যায় না, তাকে মাপতে যেমন লেসার চাই, মহাকাশযানের দূরত্ব মাপতেও তেমনি লেসার চাই। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজেও লেসারের তুলনা নেই। কেউ হয়তো খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য লেসার বন্দুক সেই গাড়ির গতি কত, পুলিশকে একটু পর পর অনায়াসে জানিয়ে দেয়। পুলিশ দেখেনি বেচারা ধারে কাছে, মনের আনন্দে চলেছে। বাড়িতে পুলিশের কাগজ এলে টনক নড়বে তারপর। পরিবেশ দূষণের কথা তোমরা শুনছো। নানা রকমের দূষণ। একটা দূষণ নিয়ে আমরা সবাই খুব ভাবনায় রয়েছি। আকাশের ওজোন স্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে। কতটা ওজোন রইল, কোথায় গর্ত তৈরি হল, কতটা তার আকার, এসব লেসার পাঠিয়ে জানা যায় আজকাল। এমন পাকামাথার যন্ত্র সবার ঘরে নেই। কিছুদিন হল, জার্মানিতে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম অপটিকস-এর বিজ্ঞানীরা বানিয়েছেন।

লেসার প্রিন্টার কথাটাও এখন সবার কাছে পরিচিত। আর সব ছাপার যন্ত্র আজকাল সেকেলে হয়ে পড়েছে। কেন? এক মিনিটে তেরো হাজার লাইন ছাপতে পারে। ঘুরিয়েও বলা যায়। এক ঘন্টায় দশ হাজার পাতা ছেপে নিতে পারে। মোটা বই ছাপতেও এক দু'দিনের বেশি লাগে না। বড়ো বড়ো দোকানে সব জিনিসের গায়ে দাম সরাসরি লেখা থাকে না। কতগুলো কালো কালো সমান্তরাল দাগ পাশাপাশি থাকে। নাম্বার লেখা থাকে। কিনে বেরোবার সময় লেসার যন্ত্র, কম্পিউটার ও প্রিন্টার-তিনজনে মিলে চোখের পলকে জিনিসের নাম ও দাম দিয়ে ক্যাশ মেমো বানিয়ে দেয়। কোন জিনিস আর কতটা রইল, সেই হিসেবও দেখায়। ফলে জিনিসের তাকে গিয়ে সরেজমিন করে বলতে হয় না। কোন জিনিস কখন আবার কিনে আনতে হবে, ক্যাশ কাউন্টারে বসেই বলা যায়। পুরোনো ছবি সারাইতে লেসার কাজে লাগানো হয়। ১৯৭১ সালে জন আসমুগ নামে এক পদার্থবিদ ইতালির শিল্পসমৃদ্ধ শহর ভেনিসে গিয়ে এই কথাটা উচ্চারণ করেন। তাঁর কদর বেড়ে যায় খুব। নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেতে থাকেন। একটার পর একটা কাজ করেও যাচ্ছেন তিনি। নানা গবেষণাতে লেসারের কদর বাড়ছে। ছোট্ট থেকে বড় সব কাজেই সমাদর। ত্রিমাত্রিক ছবির জগতের নাম 'হলোগ্রাফি'। লন্ডন কলেজ অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে ডেনিস গ্যাবর এই কাজ করে দুনিয়া জোড়া নাম কিনেছেন। লেসার ছাড়া 'হলোগ্রাফি' হয় না। যতো যাই করি আমরা, লেসার থেকে চোখ বাঁচাতে সাবধান আমাদের হতেই হবে। তেমন চশমা আজকাল মেলে যার ভেতর দিয়ে লেসার যায় না। চোখে না গলিয়ে কোন কাজে এগোনো উচিত হবে না। তবে মানুষ জানে, বিপদ সামলে কেমন করে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি রচনা করতে হয়।

★ *প্রবন্ধকার* : সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামীণ ফোন লিঃ, খুলনা; কোষাধক্ষ্য : প্রান্তিক বিজ্ঞানাগার, খুলনা।

পানি সম্পদ (Water Resources)

কাজী রিচি ইসলাম

অনেক আগে পানিকে একটি মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হতো। ১৭৮১ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিস (Cavendish) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টো মৌলিক-গ্যাসিও পদার্থের মিশ্রণে অগ্নিস্ফুলিংগের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পানি উৎপন্ন করেন এবং প্রমাণ করেন যে, পানি একটি যৌগ (Compound)। পানির রাসায়নিক সংকেত H_2O দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর এক ভাগ অক্সিজেন মেশালে পানি তৈরি হয়। তা হলে প্রথমেই আমরা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সম্পর্কে কিছু জেনে নিতে পারি–

হাইড্রোজেন : ১৭৬৬ সালে বিজ্ঞানী ক্যাভেনডিস (cavendish) হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। প্রতীক- H পারমাণবিক সংখ্যা ০১-হাইড্রোজেন পারমাণুর কেন্দ্র- নিউক্লিয়াসে রয়েছে একটি প্রোটন। কোন নিউটন নেই। এ জন্য এটাকে প্রোটিয়াম বলা হয়ে থাকে। যেহেতু একটি প্রোটন তাই একে কেন্দ্র করে একটি ইলেকট্রনই ঘুরছে। এর কোন বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ নেই। গ্যাসটি বিষাক্ত নয় কিন্তু শ্বাসরোধকারী, এক লিটার হাইড্রোজেন গ্যাসের ওজন দাড়ায় ০.০৭ গ্রাম। নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন কোন নিউট্রন নেই। তাই হাইড্রোজেন ক্ষুদ্রতম মৌল এবং সব থেকে হালকা।

অক্সিজেন : ১৭৭৪ সালে ইংরেজ পাদ্রী যোসেফ প্রিষ্টলে (Joshph Priestley 1733-1808) অক্সিজেন আবিষ্কার করেন।

হাইড্রোজেনের মতো অক্সিজেনেরও গন্ধ, স্বাদ, বর্ণ নেই। অক্সিজেন এটমের কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে রয়েছে– আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন। অক্সিজেন দহনে ও শ্বাসকার্যের জন্য অপরিহার্য।

আদর্শ চাপে (৭৬০ মি. মি) বিশুদ্ধ পানির হিমাংক (Freezing point) 0° সেলসিয়াস অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রী সেলসিয়াসে পানি জমে কঠিন আকার ধারন করে এবং স্ফুটনাংক ১০০°c তার মানে এ তাপমাত্রার পানি বাষ্পে (Steam) রূপান্তরিত হয়। যখন পানি ঠাণ্ডায় জমে বরফে পরিণত হয় তখন আয়তনে বেড়ে যায়। ফলে ঘনত্ব (Density) কমে যায়। ৯২ ঘন সেন্টিমিটার পানি ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ১০০ ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের বরফ খণ্ডে পরিণত হয়। তাই বিশাল আকারের বরফখন্ড আইসবার্ক ও পানিতে ভাসে।

এমন একটি বরফখন্ডের সাথে ধাক্কা লেগে সাগরে ডুবে গিয়েছিল টাইটানিক জাহাজ

বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের জন্য আলো, বাতাস যেমন দরকার পানিও তেমনি প্রয়োজন। পানির আরেক নাম জীবন। কেননা পানি ছাড়া বাঁচা সম্ভব নয়। শুধু মানুষ নয় জীবজন্তু, গাছপালার জন্য পানি খুবই দরকার। উদ্ভিদ ও জীব-জগতের বিভিন্ন বস্তুর দেহে শতকরা ৬০-৮০ ভাগ পানি থাকে। তাজা ফলমূল ৮০-৯০ ভাগ, আর জলজ উদ্ভিদে ৯৮ ভাগই পানি। একজন লোকের প্রায় ৩৫ গ্যালন বা ১৬০ লিটার পানি দরকার পরে গোসল করা, খাওয়া, হাত ধোওয়া, কাপড় ধোয়া প্রভৃতি কাজে। সে জন্য হয় তো পৃথিবীর তিন ভাগের দুই ভাগ পানি এক ভাগ স্থল।

পৃথিবীর উপরিভাগের ৭২ শতাংশ পানিতে ঢাকা। পানির মোট আয়তন ৩৬ কোটি ১২ লক্ষ বর্গ কি. মি.। এক ঘন কিলোমিটার পানির ওজন একশত কোটি টন। পৃথিবীর উপরিভাগের মোট আয়তন ৫১ কোটি ১ লক্ষ বর্গ কি. মি.। পানির উৎসগুলি হলো– ১. বৃষ্টির পানি (Rain water); ২. ঝরনার পানি (Spring water), ৩. নদীর পানি (River Water), ৪. সাগরের পানি (Sea water)।

১. বৃষ্টির পানি (Rain water) : প্রাকৃতিক পানির মধ্যে বৃষ্টির পানি সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ। সাগর, নদী, খাল, বিল পুকুর ইত্যাদি হতে পানি বাষ্পাকারে উড়ে যায় এবং বাষ্প শূন্যে ভেসে বেড়ায়, যাকে আমরা মেঘ বলি। মেঘে ভাসমান পানির কণার ব্যাস ৫-১০০ মাইক্রম (১ মাইক্রোন হলো ১ সে. মি. এর ১০ হাজার ভাগের এক ভাগ)। মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির পানি রুপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয় ভারতের চেরাপুঞ্জীতে। বছরে সেখানে প্রায় ১২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, এমোনিয়াম, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড প্রভৃতি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বৃষ্টির পানিতে।

২. ঝরনা পানি (Spring water) : বৃষ্টির পানি ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে মাটির স্তরে প্রবেশ করার সময় বালি, মাটি, ইত্যাদি দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে শেষে দুর্ভেদ্য এক স্তরে উপনীত হয়। এই দুর্ভেদ্য স্তরে জমা হতে হতে বেশ কিছুদিন পর ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে। অধিকাংশ ঝরনার পানিতে নানান খনিজ দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে বলে তাকে খনিজ পানি (Mineral water) বলে। পৃথিবীর বড় বড় জল প্রপাত (water falls) ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত, (আমেরিকা-কানাডার সীমান্তে), নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

৩. নদীর পানি (River Water) : পাহাড়ে গলিত তুষার, বৃষ্টি ও ঝরনার পানি প্রভৃতি প্রবাহিত হয়ে নদীতে পড়ে। নদীর পানিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, প্রভৃতির ফোরাইড, ব্রোমাইড, সালফেট ও কার্বোনেট এর লবণ মিশ্রিত থাকে। তাছাড়া নদীর পানিতে রোগ-জীবানুও থাকে।

৪. সাগরের পানি (Sea water) : নদীর পানি এসে সাগরে পড়ে। সাগর বিভিন্নভাবে মানুষের উপকারে আসে। সমুদ্রের সম্পদকে মূলত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়– (ক) প্রানীজ সম্পদ, (খ) মনিক সম্পদ, (গ) শক্তি উৎপাদনকারী সম্পদ।

সাগরের প্রধান উপাদান পানি। তাতে দ্রবীভূত আছে বহু প্রকার অজৈব পদার্থ। প্রতি ঘন কিলোমিটার পানিতে প্রায় চার কোটি টন বিভিন্ন পদার্থ দ্রবীভূত থাকে। সাগরের পানিতে এ পর্যন্ত ৭৭টি মৌল পাওয়া গেছে। সাগরে ১ ঘন কিলোমিটার জলে খাদ্যলবন থাকে ৩.৬ কোটি টন।

সাগর ও মহাসাগরের গড় গভীরতা হচ্ছে ৩,৮০০ মি. আর সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে স্থল ভাগের গড় উচ্চতা ৭০০ মি.। সবচেয়ে নীচু জায়গা প্রশান্ত মহাসাগর মরিয়ানাস ট্রেঞ্চ ১১০৪০ মিটার গভীর। আর সবচেয়ে উঁচু জায়গা মাউন্ট এভারেস্ট ৮৮৪৮ মিটার। পৃথিবীর সমস্ত সাগরে যত পানি আছে তা দিয়ে যদি একটি গোলাকার পিণ্ড তৈরি করা হতো তবে তার আকার চাঁদের এক তৃতীয়াংশের সমান হতো। পৃথিবীর উপরিভাগ যদি উঁচু-নিচু না থাকতো সবটাই যদি সমতল হতো তা হলে পৃথিবীর পানি গোলক জুরে সমানভাবে ছড়িয়ে পরত। হিসেব করে দেখা গেছে এমনই অবস্থায় পৃথিবীর গোলকটি ২২৫০মি. গভীরে নিচে ঢাকা পড়ে যেত। বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রীয় আইসটোপ কার্বন, ১৪ বা রেডিও কার্বন এর সাহায্যে পৃথিবীর বয়স সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন। সে মতে পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। কয়েক শত কোটি বছর ধরে পৃথিবী বদলেছে। সে আদি পৃথিবী অগ্নি-গোলক অবস্থা থেকে রূপান্তর ঘটেছে পৃথিবীর শিলা, মাটি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। অনেক অনেক পদার্থ দিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি তার ওজন 6×12^{21} টন। কাজেই পৃথিবীর রয়েছে মহাকর্ষ বল তাকে পৃথিবীর বেলায় বলা হয় অভিকর্ষ বল। এই অভিকর্ষ বল থাকার জন্য পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে একটা প্রচণ্ড রকমের টান আছে। আর এই টান থাকার জন্যই পৃথিবীর একটা ঘন বায়ুমণ্ডল (Atmosphene) পৃথিবীকে ঘিরে আছে।

প্রথম দিকে বায়ুমণ্ডলে সরল মৌল গ্যাস হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস পূর্ণ ছিল। এরপর সময়ের বিবর্তনের ধারায় পারিপার্শ্বিক তাপও চাপের প্রভাবে ঐ গ্যাস দু'টোর পরমাণুর কেন্দ্র নিউক্লিয়াসে আরও প্রোটন সংযোজিত হয়ে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, ক্রিস্টাল, জেনন প্রভৃতি নতুন নতুন পদার্থের সৃষ্টি হতে লাগল। এটাকেও নিওক্লিও সিনথেসিস (Neucleo-Syntheses) প্রক্রিয়া বলা হয়। এরপর বায়ুমণ্ডলের ট্রোপেস্ফিয়রে (Troposphere) (ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে কাছের স্তরটি) খুব বেশি রকমের বজ্রপাত ও বিজলী চমকানর (প্রথম দিকে এ'রকমই হত) ফলে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দু'টো গ্যাসের অণু পরমাণুর মধ্যকার বিপুল আকারে বিস্ফোরনে (Explossion) পানি সৃষ্টি হয় এবং পৃথিবীতে সম্ভবত পানিই প্রথম যৌগ। উত্তপ্ত পৃথিবীর উপরিভাগ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকে। এই ঠাণ্ডা হওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন বৃষ্টি হতো, আর এই বৃষ্টি পৃথিবীর উত্তপ্ত উপরিভাগ পড়ার সাথে সাথে আবার বাষ্প হয়ে উবে (Evaporate) যেত। আবার বৃষ্টি হতো লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বুকে এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া চলছিল। আর এই পানির জন্য উত্তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা অবস্থায় পৌঁছতে সম্ভব হয়। যখন তাপ অনেকটাই নেমে এলো তখন পানি সাথে সাথে বাষ্প হয়ে যাওয়া কমে আসল এর ফলে সেই পানি নিচু অঞ্চলে জমা হয়ে সৃষ্টি হলো– সাগর-মহাসাগর,হ্রদ প্রভৃতি এবং এসব নিয়ে বারিমণ্ডল (Biosphere)।

এক ঘন কিলোমিটার পানির ওজন ১০০ কোটি টন। সাগরের পানিতে ৭২ ধরনের জিনিস দ্রবীভূত আছে এর মধ্যে সোডিয়াম, ক্লোরাইড Nacl খাবার লবন সবচেয়ে বেশি 3.1220 ভাগ। আরও নানান প্রকার লবন, আয়োডিন, বোরন, ব্রোমিন, ফ্লুরিন, রুবিডিয়াম ইউরেনিয়াম, সিলভার, তামা, সীসা ম্যাঙ্গানীজ, জিঙ্ক, এমনকি গোল্ড।

পৃথিবীর সম্পদগুলো ভৌগলিক ভাবেই রয়েছে অসমানভাবে। পানির বেলাতেও তাই। এখানে মানুষের কোন হাত নেই।

আফ্রিকার অধিকাংশ এলাকা পশ্চিম এশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চল মেক্সিকো অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলে অধিকাংশ এলাকা জুরে ভৌগোলিকভাবেই পানি কম।

ভারত ও পাকিস্তানে কোন কোন প্রদেশের এমন কিছু গ্রাম আছে যেখানে ১৪km এর মধ্যে খাবার পানি নেই। বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী পানি এখন দুষ্প্রাপ্য। মূলত এর পেছনের কারণ হলো– ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যা এবং পরিবেশ দূষণ। বিশ্বের ৪০ শতাংশ মানুষ বসবাস করে এমন ৮০টি দেশে এখন পানি সংকটে আক্রান্ত। বিশুদ্ধ পানির অভাবে দূষিত পানি পান করে প্রতি বছর বিশ্বে এক কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। এশিয়ার আর সব দেশের মতো বাংলাদেশের পানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি কৃষিখাতে। যতো পানি বছরে ব্যবহৃত হয় তার ৯০ ভাগ যায় কৃষি জমিতে। শুকনো মৌসুমে বাংলাদেশে পানি সত্যিই দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে এবং কৃষির জন্য বড় ধরনের সংকট সৃষ্টি করে।

প্রবন্ধকার : কাজী রিচি ইসলাম
১৭/৪, রুপনগর
মিরপুর, ঢাকা।

সবচেয়ে কাছের বন্ধু উদ্ভিদের ভেষজ গুণ

হোসনে আরা পারভীন

মানুষের জীবনে সবচেয়ে কাছের এবং নিঃস্বার্থ বন্ধু হচ্ছে উদ্ভিদ। বাংলাদেশ আবহাওয়া ও উর্বর মাটির কারণে সুজলা-সফলা, শস্য-শ্যামলা। উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে এদেশের বন-জঙ্গল, গ্রাম-গঞ্জে প্রায় পাঁচ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ আছে এবং এদের মধ্যে প্রায় এক হাজার প্রজাতির বিরুৎ, লতা, গুল্ম ও বৃক্ষের ভেষজ গুণ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। জীবদেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ নানা প্রকার জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। যদি কোনো কারণে এই সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় তবে জৈবিক প্রক্রিয়া বিকার ঘটে যাকে বলা হয় রোগবালাই বা শারীরিক অসুস্থতা। এই অসুস্থ অবস্থা থেকে পরিত্রান পেতে নানা জৈব রাসায়নিক যৌগের ব্যবহার হয় এবং এটিই বিজ্ঞান ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি। যেসব উদ্ভিদের নাইট্রোজেন ঘটিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ অর্থাৎ অ্যালকালয়েড মানুষের রোগ-বালাই দমন করে শরীরকে সুস্থ সবল করে তোলে তাদের ভেষজ উদ্ভিদ বলে। এদেশের মানুষ প্রাচীনকাল থেকে এইসব ভেষজ উদ্ভিদ শারীরিক অসুস্থতায় ব্যবহার করে আসছে। শুধু গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষ, কবিরাজ বা বৈদ্যের চিকিৎসায় নয় পৃথিবী ব্যাপী হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদীয়, ইউনানি এমনকি প্রাচ্য ও পশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতির মূল উপাদান হচ্ছে এই ভেষজ উদ্ভিদ।

আদিম মানুষ সহজাত প্রজ্ঞা ও প্রবৃত্তির কারণে উদ্ভিদকে শারীরিক যন্ত্রণার উপশমক হিসেবে ব্যবহার করেছে। ব্যবহার করে ভুল-ভ্রান্তির মাধ্যমে তারা উপকারী এবং অপকারী উদ্ভিদ বাছাই করেছে। এক্ষেত্রে রাজা-বাদশাদের রাজবদ্যিগণ ছিলেন প্রধান এবং সফল ব্যবহারকারী। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর কোনো খরচ নেই থাকলেও খুব কম যা এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামর্থ্যের মধ্যেই, অন্য দিকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা এই পরম বন্ধুদের চিনি না বা এর সঠিক মাত্রার ব্যবহারবিধি জানি না। গ্রাম-বাংলায় একটা প্রবাদ আছে সেটা হচ্ছে "চিনলে বড়ি না চিনলে মা বোনদের জ্বাল দেয়ার খড়ি। তাই যে চিনতে পারে সে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতে পারে।"

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে একটি। এই বিশাল জনগণের আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত লোকবল আমাদের নেই অর্থাৎ মোট জনগণের একটা বিশাল অংশ আধুনিক চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত। কিন্তু সঠিকভাবে চিনে নিয়ে এই পরম বন্ধুটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেই অনেকে খুব সহজে রোগমুক্ত জীবন লাভ করতে পারে। আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছি, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জীববিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানে নিয়োজিত থাকায় উদ্ভিদের এই বিশেষ গুণের প্রতি আমার আগ্রহ (যদিও বর্তমান সিলেবাসে এই অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে)। আর এই আগ্রহ থেকেই বিভিন্ন লেখক, চিকিৎসকের লেখা ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে পড়াশুনা এবং এর ব্যবহারবিধি নিজের সমস্যায় প্রয়োগ করা। সকলের মাঝে পরিচিত এই পরম বন্ধুদের সচিত্র নতুন পরিচয় এবং গুণাগুণ জানানোর জন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

নয়নতারা

আঞ্চলিক নাম : নয়নতারা, নিত্যবিলাস।

বৈজ্ঞানিক নাম : Cathranthus roseus.

আবাস : নয়নতারার আদি নিবাস ইউরোপ হলেও বাংলাদেশের আনাচে কানাচে সর্বত্র এটি জন্মাতে দেখা যায়।

স্বরূপ : এটি ঘন পাতা বিশিষ্ট, বহু শাখাসমৃদ্ধ গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। কান্ড শক্ত ও কাষ্ঠল, ১ মিটারের মত লম্বা হতে পারে। শাখা ও প্রশাখার পর্বসন্ধি থেকে একজোড়া করে ডিম্বাকৃতির বিপরীতমুখী মসৃণ পাতা বের হয়। এর উপরিভাগ গাঢ় সবুজ এবং নিচের দিক হালকা বর্ণের। সারা বছরই ফুল এবং ফল হতে দেখা যায়। ফুল সাধারণত হালকা বেগুনি, গাঢ়, গোলাপী, গোলাপী এবং সাদা রঙের হয়ে থাকে। লম্বা পুষ্পদন্ডকে পাঁচ পাপড়ি বিশিষ্ট সুদর্শন ফুল ফোটে। পাপড়ির উপরের রং গাঢ় এবং নিচের দিক হালকা। ফল দেখতে সরিষার মত, লম্বালম্বি দুই প্রকোষ্ট বিশিষ্ট, প্রতিটি ফলে ১৫-৩০ টি বীজ থাকে। সম্পূর্ণ গাছটি তিক্ত স্বাদের। প্রতিদিন ফুল ফোটে বলে এই গাছের এক নাম নিত্য বিলাস।

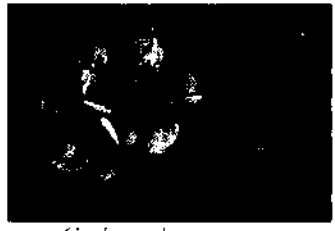

Cathranthus roseus

ভেষজ গুণ : সমগ্র নয়নতারা উদ্ভিদটি ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ, এতে প্রায় ৭০টি অ্যালকালয়েড পাওয়া যায়। যেগুলো অবসাদক, স্নায়ু উত্তেজনা নাশক ও নিদ্রাকারক।

১। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলসহ শুকনো সমগ্র গাছ ১ গ্রাম, ২ গ্রাম কাঁচা হলুদ থেঁতো এক কাপ পানিতে সেদ্ধ করে, ক্বাথটি ৪ ভাগের এক ভাগ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ঠান্ডা করতে হবে। সকাল-বিকাল কিছু খাওয়ার পর উক্ত ক্বাথটি ৮/১০ দিন সেবন করলে উচ্চ রক্তচাপ কমবে।

২। ডায়াবেটিসের জন্য উপর্যুক্ত ক্বাথটি ৮/১০ দিন সেবন করলে রক্তে চিনির পরিমাণ দ্রুত কমে যাবে। থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত ও শ্রীলঙ্কায় এটি ব্যবহৃত হয়

৩। লিউকোমিয়া একটি জটিল রোগ। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে এটি রক্তের রোগের ব্যাধি। এক্ষেত্রে নয়নতারার Vincristin এবং Vinblastin নামক Alkaliod গুলো ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়

৪। কৃমির কারণে অরুচি, অজীর্ণ, পেটফাঁপা হলে নয়নতারার উল্লিখিত ক্বাথটি ৫/৬ দিন সেবন করতে হবে।

৫। স্মৃতি শক্তি বা মেধা হ্রাস ঘটলে প্রাগুক্ত ক্বাথটি মাসখানেক পান করলে ফল পাওয়া যায়

৬। বোলতা, ভিমরুল, মৌমাছি বা যে কোন কীট দংশনে বিষের জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে নয়নতারার পাতা থেঁতো করে সেই রসটা লাগাতে হবে।

Chemical Composition : এই উদ্ভিদের পাতায়- (a) Glycoside (b) Ursolic acid (c) Alcohols (d) Alkaloids (e) Tannin (f) Carotenoids (g) Sterols (h) Oleoresin etc

নয়নতারার মূলে : (a) 24 Alkaloids - Vinosidine, Lochnerivine, Leurosivine, Cavincin etc

নটে

স্থানীয় নাম : নটে শাকের বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন আঞ্চলিক নাম রয়েছে যেমন - কাঁটা খুড়ে, সাদা নটে, ডেঙ্গা নটে, বন নটে, চিনটি নটে, লাল নটে ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম : Amaranthus spinosuls.

বাসস্থান : দেশের সর্বত্র এটি কমবেশি দেখা যায়, পথের ধারে, পতিত জমিতে, বাড়ির আশেপাশে যত্রতত্র জন্মায়।

পরিচিতি : এরা একবর্ষজীবী গুল্ম। শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট, ডাঁটা কণ্টকময়। পাতা ডিম্বাকৃতি, দুই দিকে ক্রমশ সরু

Amaranthus spinosuls

কচি গাছ সবুজ থাকলেও পরিণত বয়সে লাল ও বেগুনি বর্ণ ধারণ করে। বর্ষার পর হালকা সবুজ কাঁটাযুক্ত ফুল ও ফল হয়। পরিপক্ক বীজ কালো, চকচকে উজ্জ্বল বর্ণের।

ঔষুধিগুণ : নটে গাছের ভেষজ উপাদান রক্তবহ স্রোতে কার্যকর। এই উদ্ভিদের সম্পূর্ণ অংশ বিশেষ করে মূল ওষুধ হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

১. কাঁটা নটে গাছে Saponin রয়েছে সে কারণে এটি সর্দি কাশি সারাতে ব্যবহার করা হয়।
২. দীর্ঘদিনের পুরাতন আমাশয় এর মূল ৫/৬ টা গোলমরিচের সাথে পিসে ছোট ছোট বড়ির মতো বানিয়ে শুকিয়ে রেখে সকাল-বিকাল ১টা করে কিছুদিন খেলে রোগ উপশম হবে।
৩. বিশেষ কোনো উপসর্গ ছাড়াই কাশিতে রক্তপড়াকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে রক্তপিত্ত বলে। এটি সারাতে ১/২ মাস নটে শাকের মূল ৪/৫ চা চামচ চাল ধোয়া পানিতে ছেঁচে রসটা বেশ কিছুদিন খেলে উপকার পাওয়া যায়।
৪. অনেকে বিনা কারণে শরীরে জ্বালা অনুভব করে। এটি উপশমে ৩-৪ চা চামচ নটে শাকের রস হালকা গরম করে সকাল-বিকাল দু'বার খেতে হবে।
৫. কাঁটা নটের মূল অনিয়মিত মাসিক ও শ্বেত বা রক্তপ্রদয়ের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।
৬. কোথাও কেটে গিয়ে রক্তপাত শুরু হলে নটে মূল পানি সহ ছেঁচে কাটা স্থানে বেঁধে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

Chemical Composition : (a) Carbohydrates (b) Fat (c) Protein (d) Mineral mater (e) Calcium (f) Phosphorus (g) Iron.

বাসক

আঞ্চলিক নাম : সিংহমুখী, কাসা, কণ্ঠীরবী, বৃষ, পঞ্চমুখী ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক নাম : Adhatoda vasica

বিস্তৃতি : বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটানে বাসক গাছ দেখা যায়। বাংলাদেশের সব জেলাতে গ্রামীণ বস্তুভিটায় বিশেষ করে সমতল ভূমিতে এর দেখা মেলে। উঁচু ভিটায় বেড়া হিসাবে বাসক গাছ দেখা যায়।

দৈহিক বর্ণনা : বাসক কাষ্টল কান্ড বিশিষ্ট চিরহরিৎ বহুবর্ষজীবী গুল্ম। ঘন শাখা যুক্ত, ১-২ মিটার লম্বা হয়। পাতা লম্বা, সবুজ, দুই প্রান্ত সরু, কাণ্ড বা শাখার সাথে বিপরীত মুখী হয়ে জন্মায়। গ্রীষ্মকালে লম্বা প্রান্ত পুষ্পদমে ঘন হয়ে সাদা সাদা ফুল ফোটে।

Adhatoda Vasica

ঔষুধিগুণ : চরকের টীকাকার চক্রদত্ত বাসক সম্পর্কে লিখেছেন, 'বাসক যদি থাকে ঘরে, কাশকফ, রক্তপিত্ত যক্ষায় কেবা মরে।' বাসক গাছের ছাল ও পাতা ঔষুধি রূপে ব্যবহৃত হয়।

১. বাসকের ছাল ও পাতা ১০/১২ গ্রাম এক সাথে সেদ্ধ করে সেই ক্বাথের সাথে চিনি বা মিছরির সিরাপ মিশিয়ে খেলে শ্বাসকষ্টের উপশম হয়।

২. গায়ের দূর্গন্ধ দূর করতে বাসক পাতা ভালো কাজ দেয়।

৩. বাসক পাতায় essential oil থাকায় এটি জীবানু নাশক হিসাবে কাজ করে। তাই এক কলসী পানিতে ৩/৪টি পাতা কুচি করে ৩/৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে পানি জীবানুমুক্ত হয়।

৪। বাসক পাতা সেদ্ধ করে সেই পানি খাওয়ার পানির সাথে মিশিয়ে প্রত্যহ পান করলে বসন্ত রোগের সংক্রমন থেকে বাচা যায়।

৫। এই পাতায় বিভিন্ন অ্যালকালয়েড থাকায় ছত্রাকনাশক [illegible] ফল পাকি[illegible] কাজে ব্যবহার করা হয়।
৬। হাঁপানির টানে বাসকের শুষ্ক পাতায় বিঁড়ি বানিয়ে টানলে [illegible] যায়।
৭। বাসক পাতার রস থেকে আয়ুর্বেদী ও হেকিমি মতে সর্দি-কাশি [illegible] হাঁপানি প্রভৃতি [illegible] সিরাপ তৈরি করা হয়।

Chemical Composition : (a) Vasicine (b) l-Pegani[illegible]

ধুতুরা

আঞ্চলিক নাম : ধুতরা, ঘণ্টা ফুল।
বৈজ্ঞানিক নাম : *Datura metel*
নিবাস : ভারত ও বাংলাদেশের সর্বত্র এই গাছকে অযত্ন অবহেলায় [illegible] জন্মাতে [illegible] তবে রাস্তার ধারে একে বেশি চোখে পড়ে।
দৈহিক বৈশিষ্ট্য : ধুতুরা ঘনসন্নিবিষ্ট বড় আকৃতির একক পত্র বিশিষ্ট [illegible] উদ্ভিদ [illegible] দেড় মিটার লম্বা ও কাষ্ঠল। একটা গাছ ৪/৫ বছর বেঁচে থাকে। বর্ষাকালে [illegible] ঘণ্টাকার ফুল [illegible] এর আরেক নাম

Datura metel

ঘণ্টা ফুল। প্রজাতিভেদে ধুতুরার পাতা হৃৎপিণ্ডকার, ত্রিকোনাকার [illegible] বিশিষ্ট। [illegible] অগ্রভাগ ক্রমশ সরু। ফল সবুজ ও কণ্টকযুক্ত, পাকলে ধূসর বর্ণের হয়। [illegible] সাদা সাদা [illegible] বীজ উৎপন্ন হয়। কোনো পশু-পাখি এর পাতা ফল কিছুই খায় না।
ভেষজ গুণ : ধুতুরা উদ্ভিদের সমগ্র অংশ ভেষজ গুণ সম্পূর্ণ। এর পাতা [illegible] মূল বেশি ব্যবহার করা হয়।
১। সুশ্রুত সংহিতায় পাগলা কুকুর বা শিয়ালে কামড়ালে ধুতুরার [illegible] গ্রাম ও পুণ[illegible] মূল ৫ গ্রাম এক সাথে বেটে ঠান্ডা দুধ বা পানির সাথে পান করতে বলা হয়েছে। [illegible] কুকুর অন্য সুস্থ কুকুর বা গরুকে কামড়ালে ৪-৮ টি করে পাকা ধুতুরার বীজ সকালবেলা ৮ দিন [illegible] সুফল পাওয়া গেছে।
২। মাথায় হঠাৎ টাক পড়লে অনেকে মনে করেন তেলাপোকায় [illegible] দিয়েছে। আসলে এটা এক প্রকার ছত্রাক সংক্রমনের ফলে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাণভট্ট ধুতুরা পাতার রস [illegible] বলেছেন। তবে এতে চেতনা নাশক উপাদান থাকায় মাথায় এক অংশ করে একদিন পরপর লাগাতে হবে।
৩। ধুতুরায় Tropane alkaloide আছে যা ব্যথা-বেদনা নাশক হিসেবে কাজ করে। এর [illegible] জ্বাল দিয়ে ঘন করে লাগালে ব্যথা ও ফোলা কমে যায়।
৪। ঘাড়ে ও পিঠের ব্যথার জন্য চুন এবং পাতা এক সাথে বেটে [illegible] লাগাতে হবে।
৫। সরিষার তেলের সাথে ধুতুরা পাতার রস মিশিয়ে মালিশ করলে বাতের ব্যথা উপশম হয়।
৬। এ গাছ থেকে Daturin নামক alkaloide পাওয়া যায়, যা দিয়ে হাপ, কাশি, হাঁপানি, [illegible] ও ঘুমের ওষুধ প্রস্তুত হয়।
৭। আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্যের মতে-১ লিটার গরম সরিষার [illegible] ২ লিটার ধুতুরার পাতাসহ ডাটার রস, ২০০ গ্রাম পাতা বাটা এবং ২ লিটার পানি মিশিয়ে ভালো ভাবে জ্বাল দিতে হবে, পানি শুকিয়ে গেলে তেল ছেকে নিতে হবে, একে বলে 'কনক তেল'। এই তেল পায়ের [illegible] ফাটা এবং চুলের জন্য এক কার্যকরি ঔষধ।
৮। ধুতুরা বীজের চেতনা নাশক উপাদানের অপব্যবহার করে দুষ্কৃতকারীরা সাধারণ জনগণকে অজ্ঞান করে তাদের টাকাপয়সা, মালামাল হাতিয়ে নেয় এমনকি অনেকের জীবন বিপন্ন করে তোলে।

Chemical Composition : (a) Alkaloids, hyoscyamine [illegible] atropine, scopolamine. (b) Vitamin-c (c) Other constituents, fixed oil & allantoin

ঘৃতকুমারী

স্থানীয় নাম : ঘৃতকাঞ্চন, শরবতী, অ্যালোভেরা।

বৈজ্ঞানিক নাম : Aloe indica

অবস্থান : বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র এই উদ্ভিদ দেখা যায়, দেখতে সুদৃশ্য বলে অনেকে বাড়ির টবে লাগিয়ে থাকে

দৈহিক বিবরণ : এটি পত্রসর্বস্ব মরুজ উদ্ভিদ। কাণ্ডের চারিদিক বেষ্টন করে পাতা জন্মায়। গাছ ৫০-১০০ সে. মি. লম্বা হয়। পাতা পুরু, রসালো ও নরম। নিচের দিক উপবৃত্তাকার, উপরের দিক সমান। পাতার দুইপাশে করাতের

Aloe indica

মত কাঁটা থাকে। ভেতরের অংশ স্বচ্ছ মাংসল, হলুদাভ পিচ্ছিল রস সমৃদ্ধ। এইরস একটু উৎকট গন্ধ এবং তিক্ত স্বাদ যুক্ত। শীতের শেষে লম্বা সরু লাঠির মত পুষ্পদকে ছোট ছোট হালকা সবুজ রঙের ফুল উৎপন্ন হয়।

ভেষজ গুণ : ভেষজ উদ্ভিদ জগতে ঘৃতকুমারীর অবস্থান রাজকুমারীর মত। এর পাতা, মূল ও শুষ্ক রস ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একে শরবতের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় বলে এর এক নাম শরবতী। এটি শুক্রবহ স্রোতের উপর ক্রিয়া করে।

১। অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারীর ভেষজ উপাদান Aloin, Emodin ত্বকের যত্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাই প্রায় প্রতিটি প্রসাধনের বিজ্ঞাপনে এর ব্যবহারের কথা বলা হয়।

২। ঘৃতকুমারী পাতার রস মাথায় লাগালে মাথা ঠাণ্ডা এবং চুলের গোড়া শক্ত হয়।

৩। শুক্রমেহ হলে ৫ গ্রাম পাতার মাংসল অংশের সাথে একটু চিনি মিশিয়ে শরবত করে সকাল বা বিকালে ৬/৭ দিন পান করলে উপকার পাওয়া যায়।

৪। অনেক মেয়েদের পিরিয়ডের সময় পরিমাণে কম এবং কোমরে ব্যথা অনুভূত হয়, এক্ষেত্রে ঘৃতকুমারীর শাঁস চটকে তরল করে আমসত্ত্বের মত রোদে শুকিয়ে রেখে দিনে দুইবার ২/৩ গ্রাম শুকনো শাঁস গরম পানিতে ভিজিয়ে খেলে পিরিয়ড স্বাভাবিক হবে।

৫। হৃদযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র সবল করতে ঘৃতকুমারী পাতার নির্যাস পানির সাথে মিশিয়ে পান করলে উপকার পাওয়া যায়। এতে খাওয়ার রুচিও বাড়ে।

৬। জিহ্বায় বা ঠোঁটের কোনো ঘা হলে পাতার দুইপাশের পাতলা পরত ফেলে দিয়ে স্বচ্ছ মাংসল অংশ মুখে রাখলে ঘা সেরে যায়।

৭। কৃমির উপদ্রব দেখা দিলে ৫ গ্রাম করে ঘৃতকুমারীর পাতার মাংসল অংশ দিনে দুবার খেলে কৃমি নিয়ন্ত্রণ হবে। কাটা ও পোড়া ঘা সারাতেও এই শাঁস গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখে।

Chemical Composition : (a) Aloin (b) Isobarbaloin (c) Emodin (d) Crysophanic acid (e) Uronic acid (f) Gum (g) Resin (h) Glycosides.

সহায়ক গ্রন্থ

☑ এনায়েত হোসেন, গাজী আজমল, সফিউর রহমান, তরিকুল ইসলাম রচিত উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র। গাজী পাবলিশার্স, ৩৭ বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল- আগস্ট, ১৯৯৮ ইং।

☑ অবনীভূষণ ঠাকুর, ভেষজ উদ্ভিদ ও লোকজ ব্যবহার, প্রথম খণ্ড। অবসর প্রকাশ, ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা। প্রকাশকাল– ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ ইং।

☑ ডা. মোহাম্মদ বাবুল আক্তার, দেশজ ভেষজ ও তার লোকজ প্রয়োগ। সিসিডিবি প্রকাশন, প্রকাশকাল জুন, ২০০১।

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, জীববিজ্ঞান, ধরমপুর মহাবিদ্যালয়, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষি

তাছলিমা আক্তার

প্রকৃতির সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী, নদী, নালা, খাল, বিল, হাওর, বাওড়, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, বন, জঙ্গল, পশু-পাখি, প্রাণী, আকাশ, বাতাস, পানি, ফসল, গাছপালা, মাটিসহ দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু আল্লাহ সৃষ্টি করে মানুষদের এগুলো সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও উন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, "তিনি (আল্লাহ) সবকিছু তোমাদের (মানুষে) জন্য সৃষ্টি করেছেন (সূরা বাকারা : আয়াত-২৯)। সকল নবী রাসূল ও প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষির উন্নয়নে কাজ করেছেন এবং আমাদের উৎসাহিত করেছেন। কুরআন ও হাদিসে প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষির প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ পৃথিবী ও বেহেশত প্রকৃতি ও পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান দিয়ে সাজিয়েছেন। কোরআনে ও হাদিসে প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষির উপর ঘটনা, উদাহরণ, উৎসাহ প্রদান, সতর্কতাসহ বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কোরআনে ন্যূনতম ৬০টি সূরায় ২৫০০ এর অধিক আয়াতে এসবের উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআনে প্রকৃতি ও কৃষির অনেক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- নদীর পানি বাহিত পলি জমে মাটি উর্বর করা, বৃষ্টির পানি ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-গর্ভে সংরক্ষণ, বৃষ্টির পানিতে ফসলের উপকারী খাদ্য উপাদানের উপস্থিতি, মাটির স্তর বিন্যাস, ভূমির বন্দুরতা, বীজের অঙ্কুরোদগম, বীজ বপনের সারি পদ্ধতি, ফসলের নাম, বর্ণ, জাত, সাদৃশ্য ফসল, দানা শস্য, উদ্যান ফসল, ফুল, সুগন্ধি শস্য, উদ্ভিদের গঠন, উদ্ভিদের প্রজনন, মিশ্র ফল চাষ, ফসল সংরক্ষণ, রেশম চাষ, সেচ প্রযুক্তি, সেচের পানির সংরক্ষণ, লবণাক্ত পানিতে শস্য, পশু পালন, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগি পালন, পাখি পালন ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

জাবের (রা:) বলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে মুসলমান গাছ লাগায় উহা যা খাওয়া হয়, যা চুরি করা হয়, যা পশুপাখি খায় উহা তার জন্য সদকা হয় (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি আরোও বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অনাবাদি জমিনকে চাষ দেয় সে সওয়াব পায় (ইবনে হিব্বান)। আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মুহাম্মদ (সা) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গাছ লাগায় সেই গাছে যেই পরিমাণ ফল ধরে সেই পরিমাণ সওয়াব সে পায় (মুসনাদে আহমদ)। আপনি যদি নিশ্চিত থাকেন যে, আগামীকাল কেয়ামত হবে, আপনি তবুও আজকে একটি গাছ লাগান (আল হাদিস)। মুহাম্মদ (সাঃ) কৃষি কাজকে ও বৃক্ষ রোপণকে সওয়াবের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। যারা গাছ লাগায় তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। যারা বিনা প্রয়োজনে গাছ নষ্ট করে তারা দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে।

রাসুল (সাঃ) বিনা প্রয়োজনে গাছ কাটা ও গাছের পাতা ছিঁড়তেও নিষেধ করেছেন। গাছ থেকে ফল, ছায়া, কাঠ, গোখাদ্য, ভূমি ক্ষয় রোধ, শব্দ দূষণ রোধ, বায়ু দূষণ রোধ, মাটি দূষণ রোধ, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস রোধ, গ্রীণ হাউজ এর প্রভাব রোধসহ যত উপকার মানুষ পায় এবং যতদিন উপকৃত হবে ততদিন গাছ রোপণকারী ও সংরক্ষণকারী সওয়াব পাবে। আল্লাহ বলেন, তিনি বিভিন্ন প্রকারের লতা বিশিষ্ট ও কান্ডের উপর দন্ডায়মান বিশিষ্ট বাগান, খেজুর গাছ ও বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উদ্ভিজ ভেষজ, ফল ফলাদি, যাইতুন ও আনারের গাছ সৃষ্টি করেছেন, যা বাহ্যিক রূপে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু স্বাদে সাদৃশ্যহীন (সূরা : আনআম, আয়াত-১৪১)। আল্লাহ বলেন, আমি মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত বর্ষণ করি যাতে তা দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও পাতা ঘন উদ্যানরাজি (সূরা : আন নাবা, আয়াত-১৪-১৬)।

সকল নবী রাসূল প্রকৃতি পরিবেশ ও কৃষির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করেছেন এবং তার অনুসারীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, সকল নবী রাসূলই ছাগল পালন করেছেন। আল্লাহ পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করে প্রথমেই কৃষিপণ্য, ফল গাছ ও প্রকৃতি পরিবেশের উপর শিক্ষা দেন। নূহ (আঃ) মহা প্লাবন থেকে রক্ষার জন্য সকল পশু, পাখি, উদ্ভিদের জোড়ায় জোড়ায় নৌকায় উঠিয়ে সংরক্ষণ করেন। এখান থেকে বর্তমান পৃথিবীর এত মানুষ, পশু-পাখি, গাছপালা, বন-জঙ্গল, জীব বৈচিত্রের বিস্তার লাভ হয়েছে। ইদরিস (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মূসা (আঃ), দাউদ (আঃ) ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সহ সকল নবী-রাসূল গাছপালা, পশুপাখি, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও সমুদ্রের প্রতি সদয় ছিলেন। অনেক নবী-রাসূল পাহাড়ে, বনে ইবাদত করেছেন এবং নবুয়ত লাভ করেছেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ) সকল পশু-পাখি ও প্রাণীর ভাষা বুঝতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন ও এদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। প্রকৃতির সবকিছু তাঁর কথা অনুসারে চলতো। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ফসল উৎপাদন, ছাগল পালন, বৃক্ষ রোপণ, সেচ দেয়া ইত্যাদি কৃষি কাজ করেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেন, তোমার জমির লুকায়িত ভান্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান কর। যার জমি আছে সে যেন নিজেই তা চাষ করে। ইসলামী জীবন বিধানে মানুষের মত পশু-পাখি, প্রাণী, উদ্ভিদসহ সকল কিছুর হক আদায় করার কথা বলা আছে। এগুলোর ক্ষতি না করা, বিনা কারণে কষ্ট না দেয়া, সর্বাধিক কম কষ্ট দিয়ে জবেহ করা, লালন-পালনে আরাম দেয়া একজন প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব।

উল্লেখ্য আল্লাহর সকল সৃষ্টি সব সময় আল্লাহর জিকির করে। আল্লাহর হুকুমেই সকল সৃষ্ট জীব চলে। আল্লাহ বলেন, তিনি (আল্লাহ) সবকিছু তোমাদের (মানুষের) জন্য সৃষ্টি করেছেন (সূরা বাকারা : আয়াত-২৯)। সুতরাং সবকিছুর বংশবৃদ্ধি, সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের। অন্যথায় আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে আল্লাহর সৃষ্ট যেকোন কিছুর ক্ষতি করলে, নষ্ট করলে, ধ্বংস করলে, অপচয় করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। হাদিসে আছে সব সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর সৃষ্ট (প্রাণী বা উদ্ভিদের) এর প্রতি উত্তম আচরণ করবে সে তার নিকট অধিক প্রিয় (বায়হাক্বী)। আল্লাহ বলেন, তোমরা অপচয় করো না, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই (সূরা বনী ইসরাইল : আয়াত ২৬-২৭)।

আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবী সৃষ্টির পর ফেরেশতাদেরকে বলেন যাও পৃথিবী দেখে আস। ফেরেশতারা পৃথিবীতে নেমে দেখেন যে পৃথিবী দোলে ও নড়াচড়া করে। ফেরেশতারা আল্লাহকে পৃথিবী দোলার ও নড়াচড়া করার কথা বলেন। আল্লাহ এক মুহূর্তে পৃথিবীতে বড় বড় পাহাড় তৈরি করে ফেরেশতাদের কে আবার পৃথিবী দেখতে বলেন। ফেরেশতারা এবার পৃথিবীতে গিয়ে দেখেন পৃথিবী দোলে না। পৃথিবী স্থির রয়েছে ও বড় বড় পাহাড় স্থাপন করেছেন। আল্লাহ কোরআনে এ প্রসঙ্গে বলেন, আমি কী তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানারূপে এবং পাহাড় পর্বতকে এক পেরেক রূপে তৈরি করি নাই? (সূরা নাবা : আয়াত-৬-৭) অর্থাৎ পাহাড় পর্বত পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে।

আল্লাহ বলেন, "পৃথিবীর সকল কিছু সৃষ্টি করিয়াছি পুরোপুরি ভারসাম্য রক্ষা করিয়া।" আল্লাহ বলেন, আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে, অতপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষিত করি, আমি উহা অপসারিত করতে ও সক্ষম এবং উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি, ইহাতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল আর উহা হতে তোমরা আহার করো। (সূরা মুমিন : আয়াত-১৯)।

আল্লাহ বলেন, "আমি সব কিছুকে সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (পুরুষ ও স্ত্রী লিঙ্গ) যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। (সূরা যারিয়াত, আয়াত : ৪৯)। এতে সব উদ্ভিদ ও প্রাণি প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি করে প্রকৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ আল্লাহ পানি থেকে সব জীব সৃষ্টি করছেন। (সূরা নূহ, আয়াত-৪৫)। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের নদী, সাগর, মহা-সাগর, পাহাড়, পর্বত, ভূমি, আবহাওয়া জলবায়ু, গাছপালা, পশুপাখি, বায়ু, পানি, মাটি ইত্যাদি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। সারা পৃথিবীর প্রকৃতির এসব উপাদান একই রকম হলে ভারসাম্য থাকতো না।

প্রকৃতির সবকিছুই আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর হুকুমেই প্রকৃতির সবকিছু চলে, আল্লাহই প্রকৃতি সংরক্ষণ করেন। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য কোরআন ও হাদিসে মানুষদের তাগিদ দিয়েছেন, উৎসাহ প্রদান করেছেন। প্রকৃতির উপাদানের গুণাগুণ নষ্ট হলে ভারসাম্য থাকবে না। পরিবেশের বিপর্যয় হবে। পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হবে। মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক এমন কিছুই ইসলাম সমর্থন করে না। প্রকৃতির সবকিছু ভালো থাকলে মানুষ ভালো থাকবে। কোরআন ও হাদিসের আলোকে আল্লাহর সৃষ্টি গাছপালা, পশু-পাখি, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, সাগর, মহাসাগর, মাটি, পানি, বাতাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ব্যবহার, গুনাগুন বজায় রাখা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ রাখা আমদের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

কৃষি সর্বাধিক প্রাচীন একটি শিল্প। আদিম কালে মানুষ যখন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতো, তখন ও মানুষ গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা খেয়ে ও পশু-পাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতো। তাই কৃষি হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে আদিমতম পেশা। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে বর্তমান সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সকল স্তরেই প্রকৃতি, পরিবেশ ও কৃষির অবদান অত্যন্ত বেশি। প্রকৃতির সকল সৃষ্টির মাঝেই সৃষ্টিকর্তা বিরাজমান আছেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার ফুল, ফল ও ফসলে বিশ্বটাকে বৈচিত্রময় করে দিয়েছেন। তাই স্রষ্টা সৃষ্ট প্রতিটি জিনিস এর পরিমিত ব্যবহার করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

প্রবন্ধকার : ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়।

পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকা

পৃথিবীর পরিবেশ করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে

কৃষিবিদ আলী আকবর

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বিশ্বব্যাপী একের পর এক ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ এক ও অভিন্ন বলে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছেন জলবায়ুর ক্রমপরিবর্তনজনিত পরিবেশ বিপর্যস্ততাকে। মানুষ কর্তৃক কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত ও নিঃসারিত গ্রীনহাউস গ্যাস ক্রমাগতভাবে বাতাসে মিশে বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে তুলেছে। ফলে এই অপ্রাকৃতিক উষ্ণতা জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়ে পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে ফেলছে। মানুষসহ সকল প্রাণী, উদ্ভিদ-বৃক্ষরাজী এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব আজ যেজন্য হুমকির সম্মুখীন বিজ্ঞানীরা তাকে বলেছেন গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীর চারপাশ ঘিরে আছে বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ ঘটিত গ্যাসীয় আবরণ, যাকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল বা Atmosphere। বায়ুমণ্ডলের বয়স ৩৫ কোটি বছর এবং এর পুরুত্ব ১০ হাজার কিলোমিটার। তবে বায়ুমন্ডলের ৯৭ শতাংশই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে মাত্র ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর সকল প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমন্ডলের প্রধান গ্যাসীয় উপাদানগুলো হচ্ছে, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন, হাইড্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (সিএফসি), ওজোন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, জলীয়বাষ্প, ধূলিকণা ইত্যাদি।

এসব গ্যাসকে গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয়। বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন গ্যাসীয় উপাদানগুলোর দখলকৃত আয়তনের পরিমাণ হচ্ছে নাইট্রোজেন ৭৮.০ শতাংশ, অক্সিজেন ২১.০ শতাংশ, আরগন ০.৯৩ শতাংশ, কার্বনডাইঅক্সাইড ০.০৩৩ শতাংশ, ওজোন ০.০০০১ শতাংশ। আর বাকি অংশ অন্যান্য গ্যাসের দখলে। এই গ্যাসীয় আবরণটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে জীবজগতকে বর্মের মতো রক্ষা করে। একই সাথে এসব গ্যাস বিশেষ করে তাপশোষক ও বিকিরণকারী গ্যাস, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সূর্য থেকে যে তাপ পৃথিবীতে আসে সেই তাপকে পৃথিবীর নিরুবায়ুমন্ডলে আটকে রাখে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ভূ-পৃষ্ঠকে উত্তপ্ত রাখার এই প্রাকৃতিক নিয়মকে বলা হয় গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়া (Greenhouse effect)। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বৃক্ষ ও প্রাণীকূল বায়ুমন্ডল থেকে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে অনুকূল পরিবেশে জীবন ধারণ করতে সক্ষম হচ্ছে। পৃথিবীর ঊর্ধমন্ডলে এই গ্যাসীয় আবরণটি না থাকলে সূর্যের তাপ ভূ-পৃষ্ঠে বিকিরিত হয়ে পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যেত।

সুতরাং ধারণা করা যায়, কোন ধরনের প্রাণির পক্ষেই সেই হিমশীতল পরিবেশে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। অন্যদিকে বায়ুমন্ডলে গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ভূ-পৃষ্ঠ হয়ে উঠবে মারাত্মক উষ্ণ। উষ্ণায়নের জন্য প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংশ হয়ে পড়বে। এখন যেমনটা ঘটতে শুরু করেছে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে ক্রমাগতভাবে কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রীনহাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, আগামী ষাট বছরে বাতাসে এই গ্যাসটির পরিমাণ দাঁড়াবে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ। এটা হবে অতিরিক্ত কয়লা, খনিজ তেল, জ্বালানি গ্যাস এবং কাঠ পোড়ানোর ফলে। এসব জ্বালানি পোড়ানোর কারণে উৎপন্ন হয়। বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ৩০ শতাংশ, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে ১৫ শতাংশ এবং মিথেন বেড়েছে ১০০ শতাংশ। উনিশ শতকের (১৮০১-১৯০০) গোড়ার দিকে বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল ২০০ পিপিএম, বিশ শতকের (১৯০১-২০০০) প্রথম দিকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮০ পিপিএম, ১৯৫০ সালে তা ছিল ৩২০ পিপিএম, ১৯৫০ সালে ছিল ৩২০ পিপিএম এবং বর্তমানে ৪৫০ পিপিএম ছাড়িয়ে গেছে। এখন প্রতিবছর ৬শ' কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমন্ডলে সংযোজিত হচ্ছে। এই হারে এই গ্যাসটি নির্গমন অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সালে বায়ুমন্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫০০ থেকে ৭০০ পিপিএম।

১৮৯০ সালে বায়ুমন্ডলে গড় তাপমাত্রা ছিল ১৪.৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। ১৮৯০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫.২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করেছেন, গ্রীনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধির এই হার অব্যাহত থাকলে আগামী ২০৫০ সালে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ১.৫ ডিগ্রি সে. থেকে ৩.০ ডিগ্রি সে.। গ্রীন পিসের এক

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গড় ৩ লাখ ৫০ হাজার বছরে বায়ুমন্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড যে পরিমাণ বেড়েছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেড়েছে গত ৩শ' ২৫ বছরে। বায়ুমন্ডলে তাপ সরবরাহকারী প্রধান গ্যাস কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় তারা সূর্য থেকে বেশি বেশি তাপ শোষণ করছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে বেশি বেশি তাপ ছড়াচ্ছে।

ফলে বায়ুমন্ডল ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ছাড়া আরও যেসব গ্যাস বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা বাড়ানোর জন্য দায়ী তা হলো কারখানার চুল্লি ও শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে কার্বনমনোঅক্সাইড, গ্যাসোলিন ইঞ্জিন ও তেল শোধনাগার থেকে হাইড্রোকার্বন, পেট্রোলিয়াম শোধনাগার ও চামড়া শিল্প থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড মাত্রাতিরিক্ত কৃষিকাজ পরিচালনা থেকে মিথেন, টিএসপি সার কারখানা থেকে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, পারমাণবিক বিস্ফোরণ ও তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণ এবং রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনিং, কোল্ড স্টোরেজ, এ্যারোসল, বডি স্প্রে, ফোম প্রস্তুতকরণ, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র, দ্রাবক পরিস্কারক, খাদ্য গুদামে ব্যবহৃত স্প্রে থেকে সিএফসি, হ্যালন, মিথাইল, ক্লোরোফর্ম, কার্বন ট্রেটাক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড গ্যাস। তবে বায়ুমন্ডলের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হচ্ছে সিএফসি বা ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন গ্যাস। সিএফসির একটি অণুর তাপ ধারণ ক্ষমতা ১৫ হাজার কার্বন-ডাই-অক্সাইড অণুর সমান। আরও ভয়ঙ্কর সংবাদ হচ্ছে, একটি সিএফসি অণু প্রায় ১ লাখ ওজোন অণুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। ১৯৭৪ সালে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন, মানুষ সৃষ্ট সিএফসি অণু প্রায় ১ লাখ ওজোন অণুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। মানুষ সৃষ্ট সিএফসি গ্যাস বায়ুমন্ডলে অব্যাহতভাবে বেড়ে যাওয়ায় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ১৯৮৫ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা জানান, কুমেরুর স্ট্রাটোমন্ডলে ওজোন শুরু ক্ষয়ে বিশাল একটি গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৮ সালে এই গর্তটির আয়তন ছিল অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আয়তনের চেয়ে তিনগুণ বড়। ১৯৯৬ সালের তুলনায় বর্তমানে এই গর্তটি ২৫ শতাংশ বেড়ে গেছে। সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিবছর গড়ে ১৩০ শতাংশ হারে বেড়েই চলছে। ১৯৩১ সালে সারা পৃথিবীতে ৫৪৫ টন সিএফসি উৎপাদন করা হয়েছিল।

১৯৪৫ সালে এই উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ২০ হাজার টনে। আর বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন টন। ১৯৬৯ থেকে ১৯৮৬ সালে এই সময়ে বায়ুমন্ডলে ওজোনের পরিমাণ কমেছিল প্রায় ২ শতাংশ, একই সাথে বায়ুমন্ডলে কমে যাচ্ছে অক্সিজেনের পরিমাণও। বনাঞ্চল তথা বৃক্ষ হচ্ছে অক্সিজেন উৎপাদন ও বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ শুষে নিয়ে বাতাসকে দূষণমুক্ত রাখার প্রাকৃতিক কারখানা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য হচ্ছে যে, সেই বৃক্ষ ও বনাঞ্চল পৃথিবী থেকে মানুষ প্রতিবছর ৪১ লাখ হেক্টর নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। এর ভিতর এশিয়া থেকেই নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে ২১ লাখ হেক্টর, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে ১১ লাখ হেক্টর, আফ্রিকা থেকে ৫ লাখ হেক্টর এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে অবশিষ্টাংশ।

বিশ্বসংস্থার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, গত দেড় দশক ধরে অবিরাম ও নির্বিচার ধ্বংসের ফলে বিশ্বের মোট বনাঞ্চলের ৪০ শতাংশ ইতিমধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য বিবরণী মতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য যে কোন মূল ভূ-খন্ডের ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল থাকা প্রয়োজন। বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ২০.৬৫ শতাংশ। কিন্তু বর্তমানে এই পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। মাত্র দশ বছর আগেও এই পরিমাণ ছিল ১৯ শতাংশ। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বজুড়ে দেখা দেবে ভয়াবহ সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ (catastrophe)।

খরা, বন্যা, দাবানল, অতিবৃষ্টি, এ্যাসিড বৃষ্টি, লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, শৈত্যপ্রবাহ, লু-হাওয়া, মাত্রাতিরিক্ত গরমসহ বিভিন্ন দুর্যোগে প্রতিবছর প্রাণহানি ঘটবে বিপুল সংখ্যক মানুষ ও পশুসম্পদের। সেই সাথে অজ্ঞাত মারাত্মক বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়বে মানুষ ও প্রাণীজগতে। অপূরণীয় ক্ষতি হবে সহায়-সম্পদের। গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছে বিশ্বজুড়ে মরুপ্রবণতা। প্রতিবছর বিশ্বে ২ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকা মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে। সাহারার চারপাশে প্রতিবছর ১৫ লাখ হেক্টর নতুন নতুন এলাকা মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর ১৮৮টি দেশের দুই-তৃতীয়াংশই ক্রমবর্ধমান মরুপ্রবণ সমস্যায় আক্রান্ত। সদ্যসমাপ্ত বিশ শতকের ৯ এর দশকটি ছিল স্মরণাতীতকালের সবচেয়ে উষ্ণ দশক। গত ১০০

বছরের মধ্যে সবচেয়ে গরম যে দশটি বছর ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে তার মধ্যে ৭টি বছরই হলো গত এক দশকের। তাছাড়া উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে।
ইতোমধ্যেই এন্টার্কটিকা মহাদেশের ম্যাগনেটিক আইল্যান্ডের বরফ গলতে শুরু করেছে। ১৯৭৬ সালে গ্রীনল্যান্ডের উত্তর থেকে সুমেরু পর্যন্ত ত্রিকোণ অঞ্চলের বরফের পুরুত্ব ছিল ৫.৩৩৩ মিটার। ১৯৮৭ সালে তা কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৪.৫৪৮ মিটারে। আয়তনের দিক দিয়ে এই হ্রাসের পরিমাণ ১৫ শতাংশ। গত শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার।
বিজ্ঞানীদের অভিমত, ২১০০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে দাঁড়াবে ১ মিটার। এই হিসাবে ২০৫০ সালের আগেই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে অনেক উপকূলীয় নিরুভূমি-মালদ্বীপ, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ, ফিজি, মার্শাল, টুভ্যালু, কিরিবাতি দ্বীপাঞ্চলসহ বাংলাদেশ ও মিসরের ব-দ্বীপ এলাকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর উপকূলের অংশ। এমনকি মুম্বাই ও নিউইয়র্কের মতো সাগরঘেঁষা নগরীও তলিয়ে যাবে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে দেশান্তরী হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ২২ শতাংশ মানুষ। এছাড়া সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি যে আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে তা হলো চোখের ছানি পড়া, ত্বকের মারাত্মক ক্যান্সার বেড়ে যাওয়া, দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, জলজ খাদ্য চক্রের নিয়ামক ফাইটোপল্টাংটন ও ডায়াটম উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, সালোক সংশ্লেষণ প্রতিবন্ধকতা ফাইটোপল্টাংটন ও ডায়াটম্ উৎপাদন ব্যাহত হওয়া, সালোকসংশ্লেষণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়ে উদ্ভিদ উৎপাদন কমে যাওয়া এবং বিশ্বব্যাপী এ্যামফিবিয়ান বা উভচর প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।
ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর দ্য প্রটেকশন অব নেচারের দেয়া এক তথ্যে জানা যায়, পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে বিভিন্ন ধরনের ৮৯০ প্রজাতির প্রাণি ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। এই প্রাণিগুলোর মধ্যে রয়েছে, ২৫৯ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ২২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণি এবং অন্যান্য ৮২ প্রজাতি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সূত্র মতে, এই কারণে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর বিশ্বে ৫৫ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে।
এর মাঝে এশিয়া মহাদেশেই ১০ লাখ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, ভারতে প্রতিবছর ৫০ হাজার এবং বাংলাদেশের শুধু ঢাকায় ১৫ হাজার মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। মধ্য আমেরিকার শতাব্দীর ভয়াবহতম মিচ ঝড়ের আঘাত, চীন এবং বাংলাদেশের স্মরণাতীতকালের প্রলয়ঙ্কর বন্যার তান্ডব কিংবা সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে ঝড় বন্যা, খরা, দাবানল, শৈত্যপ্রবাহ, প্রচন্ড গরম, ভূমিকম্প ইত্যাদির মতো মারাত্মক সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে তছনচ হয়ে গেছে মেক্সিকো, হন্ডুরাস, ব্রাজিল, কিউবা, নিকারাগুয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, বেলজিয়াম, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, বাংলাদেশ, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্সসহ আরও অনেক দেশ।
গ্রীনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে জলবায়ুর যে ক্রম পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে বিশ্বব্যাপী সংঘটিত এইসব দুর্যোগের অনাকাঙ্খিত ছোবল বিজ্ঞানীদের সেই আশঙ্কাকেই সঠিক বলে প্রমাণিত করেছে। বিশ্বব্যাপী এখন উপলব্ধি করতে পারছেন যে, নিজেদের অপরিনামদর্শী কর্মকান্ডের দরুণ প্রকৃতি ও পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রুদ্র প্রকৃতির প্রতিরোধ স্পৃহার শিকার আজ বিশ্বে কোটি কোটি অসহায় মানুষ। আর মহাবিশ্বের বিস্ময় এই সবুজ ও জীবন্তগ্রহটি দুঃসহ এক অন্ধকার ভবিষ্যত পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। তাই সারা বিশ্বের কোটি কোটি অসহায় মানুষ আজ উদ্বিগ্ন। মানুষ ক্রমশই বেশ চড়ামূল্যে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছেন, প্রকৃতিবিরোধী এই অব্যাহত আত্মঘাতী তৎপরতা বন্ধ করা না গেলে প্রাণীকুল তো বটেই শেষাবধি পৃথিবী নামক এই গ্রহটির অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে।
ফারাক্কা বাঁধের কারণে ভয়াবহ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে : বাংলাদেশে প্রায় ৪ কোটির অধিক মানুষ সম্পূর্ণ নদীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কাতে বাঁধ দেয়ার কারণে উত্তর ও দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষের জীবন ও পরিবেশে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। ফারাক্কা বাঁধের কারণে এখন বাংলাদেশের শুষ্ক মৌসুমে দেখা দেয় তীব্র পানি সংকট। বর্ষাকালে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বন্যা। এ অবস্থায় ইকোসিস্টেম বা প্রতিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, যা প্রাণিকুলের জন্য অপরিহার্য।
এর ফলে জীববৈচিত্রও বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে যে সব মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে " ভূ-উপরিস্থ পানি হ্রাস পাচ্ছে। এর ফলে কৃষি, শিল্প ও বাড়ী-ঘরের ব্যবহারের জন্য গভীর-অগভীর নলকূপ ও টিউবওয়েলের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন করে চাহিদা মিটানো হচ্ছে।

ফলে ক্রমান্বয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। গাছ-গাছালি, উদ্ভিদকূলের ক্ষতি হচ্ছে, নদীর আবহমানকালের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষাকালে উজান থেকে ব্যাপক পলিমাটি আসার নদীগুলো দ্রুত ভরাট হয়ে মরে যাচ্ছে। এ কারণে কয়েকটি নদী ছাড়া শুষ্ক মৌসুমে অধিকাংশ নদীতে নৌ-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি পদ্মা নদীর মত বৃহৎ নদীতে শুষ্ক মৌসুমে ফেরী চলাচল দুরূহ হয়ে পড়েছে। 'মাছে-ভাতে বাঙালী'দের জন্য মাছ উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

মাছের উৎপাদন এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণ এখন ভারত ও বার্মা থেকে আমদানী করা মাছের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর মাছ উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হাজার হাজার জেলে বেকার হয়ে পড়েছে। এটা আমাদের অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ভূগর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ অর্থাৎ গ্রাউন্ড ও সারফেস ওয়াটার উভয় ক্ষেত্রে লবণাক্ততা দেখা দিয়েছে। এর কারণে ফসল ও মাছ উৎপাদন, পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-কারখানা, খাবার পানি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভয়াবহ ক্ষতিসাধিত হচ্ছে। এক গবেষণা ও জরিপে দেখা গেছে যে, রাজশাহী, পাবনা ও যশোর অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ০.৬ থেকে ৩.৩ মিটার নীচে নেমে গেছে। লবণাক্ততার কারণে বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। কারণ উচ্চ লবণাক্ততা ধারণ করার ক্ষমতা সুন্দরী গাছের নেই।

সেই সাথে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে যে, লবণাক্ততার কারণে ধীরে ধীরে উর্বর জমি বিষাক্ত হয়ে পড়ে। যা এক পর্যায়ে ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী হয়ে যায়। ফারাক্কার কারণে গঙ্গার পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় সবচেয়ে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে সেচ জমি। যেমন-পদ্মা-কপোতাক্ষ সেচ প্রজেক্ট। কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে এই প্রজেক্ট অবস্থিত। এই প্রজেক্টের মাধ্যমে ১ লাখ ৪২ হাজার হেক্টর জমিতে পানি সরবরাহ করা হয়। শুষ্ক মওসুমে পদ্মায় হার্ডিঞ্জ ব্রীজ পয়েন্টে যখন পানি পাঁচ মিটারের নীচে নেমে যায়, তখন আর পাম্প করে পানি উত্তোলন সম্ভব হয় না। বিগত কয়েক বছর ফারাক্কা বাঁধের কারণে শুষ্ক মওসুমে পানির প্রবাহ সাড়ে চার মিটারে নেমে যাচ্ছিল। এমন কি ৯৬ সালে পানি চুক্তির পর ১৯৯৭ সালে পানির প্রবাহ রেকর্ড পরিমাণ কমে গিয়েছিল। আর এই ঘটনার পর থেকে সব প্রকার তথ্যপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়ায় প্রকৃত চিত্র এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। আর তথ্যপ্রবাহ বন্ধ করার কারণে সন্দেহ আরও ঘনিভূত হয়েছে। তবে প্রজেক্ট এলাকায় সরেজমিনে তদন্ত করে জানা গেছে যে, চুক্তির পর শুষ্ক মওসুমে বাংলাদেশে যে, পানি পাচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য।

কোনরকমে শুষ্ক মওসুমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাম্প চালানো যায়। তবে উজানে ভারত গঙ্গা থেকে নতুন ক্যানেল কেটে হরিয়ানা ও রাজস্থানে পানি নিয়ে যাওয়ার যে কাজ শুরু করেছে, তা সম্পন্ন হলে ভবিষ্যতে শুষ্ক মওসুমে ঐ পানিও পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে বলে অনেক বিশেষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেন। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াটার' ম্যাগাজিনের মার্চ এপ্রিল-২০০০ সংখ্যার খোদ বাংলাদেশের পানিসম্পদ মন্ত্রীর যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তিনি বলেছেন যে, পানির অভাব ও ভয়াবহ দূষণ বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকায় মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ পানির অভাব ও দূষণ দুটোই বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষকে ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত এই দূষিত পানি বঙ্গোপসাগরে পতিত হবার কারণে এই উপসাগরটিও হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

প্রচন্ড দূষণের কারণেই বঙ্গোপসাগরের মাছ ও উদ্ভিদ-গুল্ম প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। নদীতে পানির অভাবে ইকোসিস্টেম অর্থাৎ প্রাণিকূলের বসবাসের উপযোগী জায়গা ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জীববৈচিত্র্য বা প্রাণিবৈচিত্র্য থাকছে না। উপযুক্ত প্রতিবেশের অভাবে জলজ ও স্থলের বহু জীবজন্তু, প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পানির অভাব ও বন-জঙ্গল সাফ করে নগরায়ন- এ দুটোই প্রতিবেশকে ধ্বংস করছে। দশ বছর আগেও রাতে হাইওয়ে দিয়ে চলাচল করার সময় বাঘ, শিয়াল, বনবিড়াল, বাঘডাসকে রাস্তা পার হতে দেখা যেত। এখন আর তা দেখা যায় না। নদীতে পানি না থাকার কারণে শম্বুক ও উদবিড়াল নামক জলপ্রাণি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে। খাল, বিল ও জলাশয়গুলো শুষ্ক মওসুমে শুকিয়ে যাওয়ার ফলে প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। অথচ মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআন শরীফে এরশাদ করেছেন, 'আমি কোন কিছুই বৃথা সৃষ্টি করিনি।' অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা এই পৃথিবীতে গাছপালা, পশুপাখি, জীবজন্তু, পোকা-মাকড়, কীটপতঙ্গ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তার কোনটাই অকারণে সৃষ্টি করেননি। তাঁর (আল্লাহতায়ালা) সকল সৃষ্টিই হয়েছে পৃথিবীর কল্যাণে। ঐসব কিছুই পৃথিবীর পরিবেশকে ভারসাম্য দান করেছে। এর যে কোন একটা বিলুপ্ত হলে পরিবেশ-প্রতিবেশ ভারসাম্যহীন হতে বাধ্য।

পরিবেশ দূষণে বিপন্ন জীববৈচিত্র্য : দেশে ১০৬ প্রজাতির গাছ, ৫৪ প্রজাতির মাছ, ৪১ প্রকার পাখি, ৪০ প্রকার সরীসৃপ ও বহু স্তন্যপায়ী প্রাণির অস্তিত্ব হুমকির মুখে : অর্জুন গাছের অভাবনীয় ভেষজ গুণের কথা অনেকেরই জানা। উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ প্রভৃতিতে অর্জুনের ছাল শুকিয়ে গুঁড়ো করে খেয়েছেন বর্তমান প্রজন্মেরও অনেকে। কিন্তু গাছটি আজ প্রায় হারিয়েই গেছে। অথচ এসব রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক বেশি হওয়ায় গাছটির প্রয়োজন এখন আগের চেয়ে বেশি। অর্জুন কম্রেটাসি পরিবারের উদ্ভিদ, বৈজ্ঞানিক নাম টার্মিনালিয়া অর্জুনা। রোগীর পথ্য কিংবা বিশেষ মুখরোচক হিসেবে মৌরালা মাছের ঝোলের সুখ্যাতি ছড়িয়ে ছিল বাংলাদেশের প্রাচীন পুঁথি থেকে এই সত্তরের দশক পর্যন্তও। কিন্তু আজকাল অনেকে এই মাছটি চেনেও না। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, তিনি প্রায় দু'সপ্তাহ বরিশালে নদীর পাড়ে তার নিজ গ্রামে অবস্থান করেও তার সন্তানকে একটিবারের জন্য শুশুক দেখাতে পারেনি। অথচ ১০ বছর আগেও সেসব নদীতে শুশুক দেখাটা ছিল অতি সাধারণ নৈমিত্তিক ঘটনা। বাংলাদেশ থেকে হারিয়ে গেছে কালো তিতির।

বাংলাদেশে বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের একমাত্র আইনটি প্রণীত হয়েছে ১৯৭৪ সালে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই আইনটির কার্যকারিতা খুবই কম। আইইউসিএন তাদের রিপোর্টে বলেছে, এখন পর্যন্ত পৃথিবী থেকে ৭৬২ প্রজাতির প্রাণী ও বৃক্ষ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আরো ৫৮টি প্রজাতি টিকে আছে নামে মাত্র। আইইউসিএনের হিসেবে পৃথিবীতে এ পর্যন্ত বিপন্ন প্রাণী ও বৃক্ষরাজির সংখ্যা ১২ হাজার ২৫৯।

প্রতি দিনে, প্রতি ঘন্টায় ও প্রতি সেকেন্ডে :

প্রতিদিন : ২৫০০০ মানুষ পানির অভাবে বা পরিবেশ দূষণে মারা যায়। পৃথিবীতে ৩৫০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎ শক্তি কেন্দ্রে ১০ টনের মতো পারমাণবিক বর্জ্য উৎপাদিত হয়। ১৩০০০ ব্যারেল অশোধিত খনিজ তৈল মহা সাগরের পানীতে মিশছে। ফলে সাগরের পরিবেশ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। উত্তর গোলার্ধে এসিড বৃষ্টি আকাশে ২ লাখ ৫০ হাজার টন সালফিউরিক এসিড নিপতিত হচ্ছে। ১৫০টির মতো প্রাণি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। ১ লাখ ৫০ হাজার নতুন যানবাহন পথে নামছে (বর্তমানে ৫১০ মিলিয়ন লসএঞ্জেলস্ শহরের এক তৃতীয়াংশ বনভূমি প্রতিদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে।

প্রতি ঘন্টায় : ৬৮৫ হেক্টর বনভূমি মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। ৬০ জন লোক কীটনাশকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে পরিবেশের কারণে। ৬০ জন লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। প্রতিঘণ্টায় পৃথিবীতে একটি প্রাণি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে। এইভাবে চলতে থাকলে আর জৈব পরিবেশ ক্রমাগত নষ্ট হতে থাকলে আরো দু'এক বছর নাগাদ প্রতি ১৮ মিনিটে একটি করে প্রাণি পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে।

প্রতি মিনিটে : মানুষ প্রতি মিনিটে ৬০০০০ টন পেট্রোলিয়াম পোড়াচ্ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ২২০০০ হেঃ পরিমাণ বনভূমি উজাড় করে দিচ্ছে। ১৩৮০০ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) বাতাসে মিশছে।

আজ দূষিত-সাগর-মহাসাগর : মানব অস্তিত্ব সুরক্ষায় সাগর-মহাসাগরের অবদান অপরিসীম। আলো, বাতাস, পানি, ভূমি, বন, পাহাড় এবং বিভিন্ন জীব প্রজাতি নিয়ে গড়ে উঠেছে এই পৃথিবী। পৃথিবীর সুষ্ঠু পরিবেশ বলতে এসব উপাদানের সুসমন্বিত উপস্থিতি ও বিন্যাসকে বুঝায় মানব অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশের অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত। দুর্ভাগ্যজনক হলেও বলতে হচ্ছে, নানা অনাচার, দূষণ ও অবক্ষয়ে পৃথিবীর পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। পানির উৎস সাগর-মহাসাগরও রেহাই পায়নি বিপর্যকর প্রতিক্রিয়া থেকে। সাগর-মহাসাগর ভয়াবহ দূষণের শিকার। জীব ও জীবন-পরিবেশ সংরক্ষণে সাগর-মহাসাগর ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। সাগর-মহাসাগরের আয়তন পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৭০ শতাংশ।

পানি ছাড়াও সাগর-মহাসাগরে রয়েছে সম্পদরাজি। এর পানির প্রায় ৯৭ শতাংশই লবণাক্ত, যা সাগর সম্পদ সংরক্ষণে অপরিহার্য। প্রাণিসম্পদের ৯০ শতাংশই রয়েছে সাগর-মহাসাগরে। উদ্ভিদের বিশাল সমাবেশ ঘটেছে এখানে। বায়ুমন্ডলে নিরন্তর অক্সিজেনের প্রবেশ ঘটছে। এর ৭০ শতাংশই আসছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ থেকে। লবণ ও মৎস্যের ভান্ডার হলো সাগর-মহাসাগর। এছাড়াও এখানে তেল, গ্যাসসহ বহু মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। জীবচক্র পরিচালনায় সাগর-মহাসাগর অপরিমেয় অবদান রাখছে। এই সাগর-মহাসাগর যদি দূষণের শিকার হয়, অকার্যকর হয়ে পড়ার পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, তবে পৃথিবীর কি পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

সাগর-মহাসাগর ছাড়া কি পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকে থাকা সম্ভব? আবহাওয়ার পরিবর্তন, ওজোন স্তরের ক্ষয়, গ্রীন হাউস প্রভাব, জীববৈচিত্র্যের বিনাশ, বস্তু দূষণ, ভূমিক্ষয় ও মরুপ্রক্রিয়ার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এবং বিষাক্ত রাসায়নিক, কঠিন ও তেজস্ক্রিয় ও অপরিশোধিত তরল বর্জ্য নিক্ষেপ সাগর-মহাসাগর দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণ। সাগর-মহাসাগর অপ্রতিরোধ্য দূষণ প্রক্রিয়ার অসহায় শিকার, যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া মানবজীবন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পতিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষণজনিত কারণে প্রতি বছর বিশ্বে অন্তত ৫৫ লাখ লোক মারা যাচ্ছে, যার পেছনে সাগর-মহাসাগর দূষণের ভূমিকাও আছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির মতে, সাগর-মহাসাগর দূষণে প্রতি বছর ১০ লাখ পাখি এবং লক্ষাধিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ও কচ্ছপ মারা যাচ্ছে। উল্লেখ্য নিষ্প্রয়োজনে, মৎস্যসহ অন্যান্য সম্পদও বিনাশ হচ্ছে। এই সর্বনাশ থেকে সাগর-মহাসাগরকে রক্ষা করতে হবে, রক্ষা করতে হবে আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থেই। বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের দেশ। আমাদের দেশের অস্তিত্বের অনিবার্য অনুষঙ্গ এই উপসাগরও নিরন্তর দূষণের শিকার হচ্ছে। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে মৎস্যসম্পদের বিপুল সমাবেশ। এছাড়া গ্যাসসহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদও রয়েছে। অব্যাহত দূষণে এসব সম্পদ নষ্ট ও ধ্বংস হচ্ছে।

প্রতিকূল পরিবেশে হারিয়ে যাচ্ছে দেশের জীববৈচিত্র্য : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন প্রাণির বেঁচে থাকার প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, কমে যাচ্ছে বনজঙ্গল। সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে বহু বন্যপ্রাণী ও পাখির আবাসস্থল। এ অঞ্চল থেকে তিতির, কাঠময়ূর, বালিহাঁস, লাল মাছরাঙা, চন্দনা, ঘরিয়ালসহ অনেক প্রজাতির পাখি হারিয়ে গেছে। নিশুতি রাতে ডাহুকের মিষ্টি ডাক এখন আর শোনা যায় না। অতি শিকারের কারণে ঘুঘু প্রজাতিও বিলীন হতে চলেছে। ভোরে ঘুম ভাঙলে এখন আর ঘুঘুর ডাক শোনা যায় না। বুলবুলি পাখিও তেমন নজরে পড়ে না। কমে গেছে বাবুই পাখির সংখ্যাও। উঁচু তাল বা নারিকেল গাছে সুদৃশ্য বাবুই পাখির বাসা নজরে পড়ে না। রাতে প্যাঁচার ডাক শোনা যায় না।

যদি আগের দিন বলা হতো প্যাঁচার ডাক অমঙ্গলের প্রতীক। ঝুটকুলি, কাঠঠোকরার সংখ্যাও একেবারে কমে গেছে। আগের দিনে গরমকালে আকাশে অনেক চাতক উড়তো। বলা হতো চাতক উড়লে বৃষ্টি নামবে। সে চাতকদেরও এখন আর দেখা মেলে না। কমে গেছে চিলের সংখ্যা। বিল-বাঁওড় অঞ্চলে দু'চারটি বিলে কখনো দেখা মেলে। শিকারী পাখি বলে খ্যাত বাজপাখিও বিলীন হওয়ার পথে। প্রকৃতির সুইপার বলে খ্যাত শকুনের দেখা মেলা ভার। আগে দিনে সুউচ্চ ছাতিয়ান বা শিমুল গাছে শকুন বাসা বাধতো। শকুনের বাচ্চার ডাক শিশুর কান্নার মতো শুনাতো। টিয়ার সংখ্যাও কমে গেছে। এখন আর টিয়া পাখি ঝাঁক ধরে আকাশে উড়তে দেখা যায় না। এক তথ্যে জানা যায়, বাংলাদেশ থেকে ৪২ প্রকার পাখির প্রজাতি হারিয়ে গেছে। পাখি প্রজাতি বিলীনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মানুষের বসতি গড়া ও চাষাবাদের জন্য বনজঙ্গল কেটে ফেলা। তাছাড়া পাখির খাবারের পরিমাণও কমে গেছে। পাখির খাদ্য হচ্ছে গাছের ফল ও কীটপতঙ্গ। পাখির খাদ্যের মত ফলবান বৃক্ষও খুব কম মেলে।

জমিতে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। পাখির খাদ্য হিসেবে পরিচিত অনেক কীটপতঙ্গ নিঃশেষ হয়ে গেছে। জমিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত ভারতীয় কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ফসলের উপকারী পোকার সাথে সাথে ব্যাঙ মারা গেছে। সোনা বর্ণের কোলা ব্যাঙের সংখ্যা কমে গেছে। বর্ষা নামলে ব্যাঙের ডাকের আওয়াজ তেমন শোনা যায় না। নানা ভাবে নিধনের ফলে ঝাঁকে ঝাঁকে বক উড়তে খুব কম দেখা যায়। কালবৈশাখী ঝড়ের আগ মুহূর্তে ঝাঁক ধরে বক উড়তো, দেখতে আকর্ষণীয় লাগতো।

মৌচাকের সংখ্যাও কমে গেছে। মানুষের নৃশংসতা ও বিপন্ন পরিবেশের কারণে বহু বণ্যপ্রাণী বিলীন হয়ে গেছে বা হতে চলেছে। এক সময় দেশের পশ্চিমের ঝিনাইদহ, মাগুরা, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলায় প্রচুর সাজারুর বিচরণ ছিল। বনের ভেতর মাটির গর্তে এদের বাস ছিল। নিশুতি রাতে আহার সংগ্রহে বের হতো সজারু। চলাচলের সময় ঝুনঝুন আওয়াজ হতো। এ প্রাণির এখন আর দেখা মেলে না। ধূসর হনুমানের প্রজাতি নেই বললেই চলে। শুধু যশোরের কেশবপুরে নানান প্রতিকূলতার মাঝেও কয়েকশ হনুমান বেঁচে আছে। ভাম, নেইল, সোনালী বিড়াল, খাটাস, মেছোবাঘ, বনবিড়াল এ অঞ্চল থেকে প্রায় বিলীন হয়ে পড়েছে। গুইসাপও বিলীন হবার পথে। কদাচিৎ এর দেখা মেলে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের কার্যকারিতা গ্রামাঞ্চলে নেই। তাছাড়া গ্রামের মানুষের মাঝে অজ্ঞতাও আছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কোন দফতর নেই। পরিবেশ আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয় না। এ প্রসঙ্গে পরিবেশবিদদের অভিমত হলো, পূর্বে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গা থাকতো, ঝোপ জঙ্গল থাকতো, এখন আর তা নেই। এতে অনেক প্রাণীর আবাস ধ্বংস হয়ে গেছে, দেখা দিয়েছে খাদ্যের অভাব। এসব বহুমুখী কারণে হারিয়ে যাচ্ছে জীব বৈচিত্র্যও।

প্রবন্ধকার : কৃষিবিদ অধ্যক্ষ (অবঃ) মনোয়ারা মণ্ডল, ধর্মপুর পূর্ব চৌমুহনী কুমিল্লা।

জগদীশ চন্দ্র বসু : রেডিও বিজ্ঞানের জনক

নূরুন নাহার কবিতা

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু একজন বাঙালি পদার্থবিদ, উদ্ভিদবিধ ও জীববিজ্ঞানী এবং প্রথম দিকের একজন কল্পবিজ্ঞান লেখক। তার গবেষণা উদ্ভিদবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা করে। ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্স তাকে রেডিও বিজ্ঞানের জনক বলে অভিহিত করে।

জগদীশ চন্দ্র বসু ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি অঞ্চলের ময়মনসিংহে জন্মগ্রহণ করেন। বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে তার পরিবারের প্রকৃত বাসস্থান ছিল।

তার পিতা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ভগবান চন্দ্র বসু তখন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এরপূর্বে তিনি ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল ছিল জগদীশ চন্দ্র বসুর প্রথম স্কুল, ইংরেজ সরকারের অধীনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হয়েও তিনি তার ছেলেকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি না করিয়ে মাতৃভাষা আয়ত্ব করা উচিত বিবেচনায় বাংলা মাধ্যমে ভর্তি করান। বাংলা স্কুলে পড়ার ব্যাপারটি জগদীশ চন্দ্রের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় রচিত জগদীশের বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলোয়। জগদীশ চন্দ্র বসু কোলকাতার হেয়ার স্কুল থেকে পড়াশোনা করে ১৮৭৯ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এই কলেজে ইউজিল ল্যাফন্ট নামক একজন খ্রিষ্টান যাজক প্রকৃতি বিজ্ঞানের উপর তার আগ্রহ বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর তিনি আই সি এস পরীক্ষা দিতে ইংল্যান্ডে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও তার বাবা রাজি হননি। ১৮৮০ সালে তিনি বাবার ইচ্ছায় চিকিৎসা বিজ্ঞান পাঠের উদ্দেশ্যে লন্ডনে পাড়ি জমান। কিন্তু অসুস্থতার কারণে বেশি দিন এই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন নি। তার ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসুর আনুকুল্যে জগদীশ চন্দ্র প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ক্যামব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। সেখানে থেকে ট্রাইপস পাস করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি সম্পন্ন করেন। ক্যামিব্রিজে জন উইলিয়াম স্ট্রাট, মাইকেল ফস্টার, জেমস ডেওয়ার, ফ্রান্সিস ডারউইন, সিডনি ভাইনসের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞান সাধকেরা তার শিক্ষক ছিলেন।

১৮৮৫ সালে জগদীশ ভারতে ফিরে আসেন। তৎকালীন ভারতের গভর্ণর জেনারেল জর্জ রবিনসনের অনুরোধে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট বসুকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। কলেজে যোগ দেওয়ার এক দশকের মধ্যে তিনি বেতার গবেষণার একজন দিকপাল হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার প্রথম আঠারো মাসে জগদীশ যে সকল গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তা লন্ডনে রয়েল সোসাইটির জার্ণালে প্রকাশিত হয়। এই গবেষণা পদগুলোর সূত্র ধরেই লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাকে ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করেন। জগদীশের আঠারো মাসের সেই গবেষণার মধ্যে মুখ্য ছিল অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ সৃষ্টি এবং কোন তার ছাড়া একস্থান থেকে দূরের অন্যস্থানে প্রেরণে সফলতা, ১৮৮৭ সালে বিজ্ঞানী হেরুস প্রত্যক্ষভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। এ নিয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শেষ করার আগেই তিনি মারা যান। জগদীশ চন্দ্র তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে সর্বপ্রথম প্রায় ৫ মিলিমিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গ তৈরি করতে সক্ষম হন। এ ধরনের তরঙ্গকেই বলা হয় অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ।

আধুনিক রাডার, টেলিভিশন এবং মহাকাশ যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই তরঙ্গের ভূমিকা অনস্বীকার্য, মূলত এর মাধ্যমেই বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ তথ্যের আদান-প্রদান ঘটে থাকে, জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞানের আরো গবেষণায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছিলেন, যার জন্য তার সুখ্যাতি সে সময়ই ছড়িয়ে পড়েছিল। বাঙালীরাও বিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে নিউটন-আইনস্টাইনের চেয়ে কম যায় না তিনি তা প্রমাণ করেন।

প্রবন্ধকার : নূরুন নাহার কবিতা, সহকারী শিক্ষক, নূর কিন্ডারগার্ডেন, ২৩১, লালবাগ রোড, ছোট ভাট মসজিদ (সুবন্ধন সংগঠন, সংলগ্ন) ঢাকা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন আবশ্যক
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANSDOC Library Dhaka

জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শনের সময়

শনিবার থেকে বুধবার ঃ সকাল ৯-০০ থেকে বিকাল ৫-০০
(শুক্র বার সকাল ১০.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা এবং দুপুর ২.০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত)

বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘর গ্যালারী খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৯১১৪১২৮